৬.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. E.H.Carr—International Relations between the two World Wars. ঐ (বাংলা ভাষান্তর) ডঃ প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

২. David Thomson—Europe since Napoleon.

৩. A.J.P. Taylor— The Origins of the Second World War.

৪. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়— আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।

৫. অতুল রায়— আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

৬. Garthorne Hardy— A short history of International Relations.

৬.১০ অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১. লীগ চুক্তিপত্রের কত নম্বর অনুচ্ছেদে নিরস্ত্রীকরণ বিধৃত রয়েছে?

২. অস্থায়ী মিশ্র কমিশন কবে গঠিত হয়?

৩. জেনেভা প্রটোকল কবে গৃহীত হয়?

৪. ওয়াশিংটন সম্মেলন কখন, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

৫. এর উদ্দেশ্য কি ছিল?

৬. প্রস্তুতি কমিশন কত সালে গঠিত হয়?

৭. জেনেভা প্রটোকলের ব্যর্থতার জন্য কোন রাষ্ট্র দায়ী ছিল?

৮. লোকার্নো সম্মেলন কোথায়, কখন অনুষ্ঠিত হয়?

৯. ক্ষুদ্র আঁতাত কী?

১০. লোকর্নো সম্মেলনে জার্মানির কোন সীমান্তটি গ্যারাণ্টি পায়নি?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

১. লয়েড জর্জের স্মারকলিপিটি কী ছিল?

২. জেনেভা প্রটোকলের উদ্দেশ্য, কার্যাবলী ও ব্যর্থতা বর্ণনা করুন।

৩. লোকার্নো সম্মেলনের বাস্তব সমস্যাটি আলোচনা করুন।

৪. এই সম্মেলনে পরস্পরবিরোধী সমস্যার উদ্ভব হ'ল কেন?

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন

১. ওয়াশিংটন সম্মেলন কেন আহুত হয়? এই সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

২. প্রস্তুতি কমিশনের উদ্দেশ্য কী ছিল? এর সমস্যাগুলি বর্ণনা করুন।

৩. লোকার্নো চুক্তির পটভূমিকা কী ছিল?

৪. লোকার্নো চুক্তির একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখুন।

৫. নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণের মূলে কী ভাবনা কাজ করেছিল? এই জন্য লীগ বর্হিভূত কী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল?

৬. নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে লীগের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৬.৮.৮ লোকার্নো চুক্তির সমালোচনা

বস্তুতপক্ষে লোকার্নো চুক্তি আঞ্চলিক নিরাপত্তা সাধন করলেও স্থায়ী শান্তি আনতে পারেনি। নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে কোন সুরাহা হয়নি। তাই সমরাস্ত্র বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ পর্যন্ত অন্য এক বিশ্বযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার নিরাপত্তা সমস্যার সমাধানে চুক্তিগুলি গুরুত্বপূর্ণ হলেও নিরাপত্তাকে কিন্তু কার্যকর বা বাস্তবায়িত করতে পারেনি। যে সহযোগিতা, সমঝোতা দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে হ'ল তা ছিল ক্ষণস্থায়ী।

আবার এই চুক্তির দ্বারা ফ্রান্স একাকী পূর্ব ইউরোপের নিরাপত্তা ভারে জর্জরিত হয়ে পড়ে যদিও ব্রিটেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের চুক্তিপত্র অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের ঘোষণা করেছিল তবু ব্রিটেন যে পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির সীমান্ত রক্ষার জন্য সমর ব্যবস্থা গ্রহণে অনিচ্ছুক তা বোঝা গিয়েছিল। তাই ক্ষুদ্র আঁতাতভুক্ত হবার কারণে ফ্রান্সের উপর পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অতিরিক্ত দায় এসে পড়েছিল।

এই চুক্তির কিছু বাস্তব সমস্যা (realistic problem) দেখা গিয়েছিল, যেটা সেই সময়ে তেমনভাবে উপলব্ধি করা হয়নি। এখানে একটি অবাস্তব ব্যাপার ঘটেছিল যার পরস্পর বিরোধী প্রকৃতিকে একটি সাধারণ ক্ষেত্রে মেলাতে পারা যায়নি। সম্ভাব্য জার্মান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের মিলিত সামরিক সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি ছিল। একই সঙ্গে ফরাসী আক্রমণ প্রতিরোধের ইঙ্গ-জার্মান যৌথ সামরিক সহযোগিতার আশ্বাস ছিল। এই পরস্পরবিরোধী অবাস্তব ব্যাপারটি কারো সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীকালে এই অবাস্তব ও স্ববিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী (absurdities) নিরাপত্তা সমস্যাকে জটিল করে তোলে।

৬.৮.৯ লোকার্নো চুক্তির তাৎপর্য

এই সময়ে যে আশা, সদিচ্ছা সর্বত্র বিরাজ করছিল তার পরিমণ্ডলে ভবিষ্যতে লোকার্নো চুক্তির এই তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়নি। এই ত্রুটিগুলি পরবর্তীকালে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু সমকালীন ইউরোপে লোকার্নো চুক্তি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এক নব দিগন্ত উন্মুক্ত করেছিল "Locarno gave to Europe a period of peace and hope". বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে নতুন সম্পর্কের সূচনা যে মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল সেই পরিবেশে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, বলেছিলেন "এটি যুদ্ধের বৎসর এবং শান্তির বৎসরের মধ্যে প্রকৃত বিভাজন রেখা।" সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিরাও তাঁর উক্তিকে যথার্থ বলে মেনে নিয়েছিল। পরবর্তী কয়েক বছর ইউরোপীয় রাজনীতির ও ঘটনাবলীর গতিধারা লোকার্নো নির্ধারিত পথে প্রবাহিত হয়েছিল। স্বল্পকালের জন্য হলেও শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে লোকার্নোর চুক্তি সক্ষম হয়েছিল।

৬.৯ সারাংশ

ভার্সাই সন্ধিতে মিত্রশক্তি জার্মানির নিরস্ত্রীকরণ সম্পূর্ণ করেছিল এবং লীগ চুক্তিপত্রের আট নম্বর ধারা অনুযায়ী জাতিসঙ্ঘের সদস্যরা স্থির করেছিল তাঁরা শান্তি ও জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে নিজ রাষ্ট্রের সমরসজ্জা হ্রাস করবে। তাই জার্মানির সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে মিত্রপক্ষে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে অস্ত্র সীমিতকরণ বিষয়টি পরস্পরবিরোধী প্রকৃতি লাভ করেছিল। মিত্র রাষ্ট্রবর্গ জাতীয় নিরাপত্তাকে সর্বাগ্রে স্থান দেয় অথচ জার্মানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম অস্ত্ররক্ষা স্বীকৃত হ'ল না। এই পরস্পরবিরোধী নীতির সংঘাতই নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সৃষ্টি করে। আরো বিষদভাবে বলা যায় নিরস্ত্রীকরণ অধ্যায়টি এই পরস্পরবিরোধী নীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল।

সময়কালীন জার্মানির অবস্থা প্রসঙ্গে বলেছেন, "Germany was brought back into the magic circle of great powers, and seemed likely to take her place in international relations as a conciliatory and unaggressive power"।। প্রকৃতপক্ষে এক সৌহার্দ্যমূলক পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ ভাবে ফ্রান্স ও জার্মানি উভয়ের মধ্যেকার বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নিশ্চিহ্ন করার প্রয়ার ছিল লোকার্নো সম্মেলনের। শুধু ফ্রাঙ্কো-জার্মান সম্পর্কেই নয় সমগ্র ইউরোপেই এক শান্তির পরিমণ্ডল রচনা করে লোকার্নো চুক্তিগুলি, বলা হয়ে থাকে। বলা যেতে পারে অনুকুল পরিস্থিতিতে ১৯২৫ সালে সম্পাদিত চুক্তিগুলি নিঃসন্দেহে ইউরোপে শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে লোকার্নো চুক্তি এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এটি ছিল যুদ্ধ ও শান্তির যুগের মধ্যে প্রকৃত বিভাজন রেখা। সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে চুক্তির দ্বারা উত্তেজনা হ্রাস (Pacification by pact) করার ক্ষেত্রে লোকার্নো চুক্তির অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৬.৮.৭ লোকার্নো চুক্তির ত্রুটি

তবে লোকার্নো চুক্তিটি ত্রুটিহীন ছিল না। এই চুক্তি সমকালীন পরিস্থিতিতে ফ্রাঙ্কো-জার্মান সীমান্ত সম্পর্কে ফ্রান্সের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধানের ব্যবস্থা করলেও জার্মানির পূর্ব সীমান্তের রাষ্ট্রগুলি যেমন পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া তাদের জার্মানির সঙ্গে সীমান্ত সম্পর্কে কোন প্রকার নিরাপত্তার আশ্বাস পায় নি। ফলে এইসব রাষ্ট্রগুলি লোকার্নো চুক্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। ফ্রান্সের পূর্ব ইউরোপের মিত্ররাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তার প্রশ্নটি তাই অমীমাংসিত রয়ে যায়।

এই চুক্তি আলোচনায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে আহ্বান জানানো হয়নি। রাশিয়ায় তাই এই চুক্তির সম্পর্কে বিরূপব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কারণ রুশ-জার্মান মিত্রতায় এইভাবে ফাটল সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। রাশিয়াকে ইউরোপের কূটনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানিকে র‍্যাপলো চুক্তির মৈত্রী বন্ধন থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তাই সোভিয়েত রাশিয়া এই চুক্তিকে সোভিয়েত বিরোধী বলে অভিহিত করেছিল।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রনায়করা তাঁদের কর্মপদ্ধতির মধ্যে দিয়ে এই ধারণার সৃষ্টি করেছিলেন যে ভার্সাই চুক্তির শর্তগুলি নৈতিকভাবে সমর্থনীয় নয় এবং এই শর্তগুলি পরবর্তীকালে অন্য কোন চুক্তি দ্বারা সমর্থিত না হলে তা ভঙ্গ করা যাবে। তাই এরপর থেকে ভার্সাই চুক্তি লঙ্ঘন করার এক তীব্র প্রবণতা দেখা যায়।

লোকার্নো চুক্তি জার্মানির পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তের মধ্যে এক অসঙ্গত পার্থক্য রেখা টেনেছিল। ব্রিটেন এবং ইতালি জার্মানির পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে গ্যারাণ্টি দিলেও পূর্ব সীমান্ত ক্ষেত্রে কোন আশ্বাস দেয়নি। বস্তুতপক্ষে জার্মানির এই দুই সীমান্তের ব্যাপারে ব্রিটেনের এই পার্থক্য লীগ চুক্তি পত্রে বিধৃত যৌথ নিরাপত্তার উপর আঘাত হেনেছিল এবং তা ছিল 'Locarno Spirit'-এর উপর বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। জার্মানির পশ্চিম সীমান্ত বিষয়ে ব্রিটেনের অনায়াস স্বীকৃতি এবং পূর্ব সীমন্তের ক্ষেত্রে অনিচ্ছা দুটি সীমান্তের মর্যাদার শ্রেণীবিভাগ করেছিল। নিরাপত্তার দৃষ্টিভঙ্গিতে পশ্চিম সীমান্ত প্রথম শ্রেণীর ও পূর্ব সীমান্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্য্যাদা লাভ করেছিল। এই সীমাবদ্ধতার সুযোগ নিয়ে নাৎসী জার্মানি পূর্ব দিকে সম্প্রসারণশীল নীতি অনুসরণ করে। তাই নাৎসী জার্মানির East Ward Policy বা Drang Nach Osten নীতি অনুসারে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব ইউরোপ জার্মান বিস্তারনীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। কারণ এখানে সম্প্রাসারণ নীতি ব্রিটেন কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হবে না এটা জার্মানি উপলব্ধি করেছিল। A.J.P.Taylor —এর মত অনুসরণ করে বলা যায় লোকার্নোর পর থেকে ব্রিটেনের জার্মান তোষণ নীতি শুরু হয়। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে ব্রিটেন জার্মানিকে তোষণ (appease) করতে শুরু করে।

জার্মানি-পোল্যাণ্ড, জার্মানি- চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে সালিসি চুক্তি এবং পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের পৃথক প্রতিশ্রুতি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

দ্বিতীয়ত, ১৯২২ সালের ১৬ই এপ্রিল র‍্যাপালোতে (Rapallo) স্বাক্ষরিত হয়েছিল রুশ-জার্মান মৈত্রী চুক্তি যাতে রুশ-জার্মান বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি ছিল। লোকার্নো চুক্তির সময়কালে জার্মানির আশঙ্কা হয়েছিল পশ্চিমী জাতিসঙ্ঘ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে লীগের ষোল নম্বর ধারা অনুযায়ী জার্মানির সহায়তা চাইতে পারে। যাতে তার (জার্মানীর) ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। তখন ইউরোপীয় শক্তিগুলি লীগ চুক্তিপত্রে ষোল নম্বর ধারাটি ব্যাখ্যা করে বলেন যে লীগ সদস্য হিসাবে তাঁরা ওই ধারা সমর্থন করলেও যে কোন রাষ্ট্রে সহায়তা দান তার (রাষ্ট্রটির) সামরিক ক্ষমতা ও ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। তাই জার্মানিকে আশ্বস্ত করে বলা হয় যে তার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কোন সহায়তা দান করতে হবে না। অর্থাৎ নিরস্ত্রীকৃত রাষ্ট্র হিসাবে জার্মামির কাছ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কোনরূপ সামরিক সহায়তা চাওয়া হবে না। এইরূপ ব্যাপক আলোচনার পর ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিরা সুইজারল্যাণ্ডের লোকার্নো শহরে সমবেত হন এবং স্বাক্ষরিত হয় লোকার্নো চুক্তি (১৯২৫)।

৬.৮.৪ ত্রিস্তরীয় চুক্তি

লোকার্নো অধিবেশনে মোট তিন ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। (১) ফ্রাঙ্কো-জার্মান ও বেলজিয়াম-জার্মান সীমান্তের গ্যারাণ্টি চুক্তি। প্রধানত এটিই ছিল লোকার্নো চুক্তি। এই চুক্তি ব্রিটেন ও ইটালী কর্তৃক সমর্থিত হয়েছিল। (২) একাধারে জার্মানি ও অন্যদিকে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সালিশি চুক্তি। (৩) ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে পারস্পরিক গ্যারাণ্টি চুক্তি।

এই ত্রিস্তরীয় চুক্তি ১৯২৫ সালের ১লা ডিসেম্বর লণ্ডনে আনুষ্ঠানিক ভাবেস্বাক্ষরিত হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে লোকার্নো চুক্তির প্রকৃতি ছিল পারস্পরিক অঙ্গীকারমূলক ও সালিসিমূলক।

৬.৮.৫ চুক্তির উদ্দেশ্য

লোকার্নো চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল সীমান্ত সমস্যার সমাধান ও বিজয়ী এবং বিজিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ভীতি দূর করে মৈত্রী বন্ধন দৃঢ় করা। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের ইতিহাসে এ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল এই লোকার্নো চুক্তি। কারণ এই প্রথম জার্মানি ও ফ্রান্সের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণই ছিল এই চুক্তির উদ্দেশ্য।

৬.৮.৬ লোকার্নো চুক্তির অবদান

লোকার্নো সম্মেলনে জার্মানির প্রতি এই প্রথম মিত্রজনোচিত ও সমমর্যাদা সম্পন্ন মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছিল। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের মধ্যেও একটি অভূতপূর্ব সৌহার্দ্যের মনোভাব লক্ষিত হয়। পরিবর্তিত এই মনোভাব 'Locarno Spirit' নামে অভিহিত হয়েছিল। যা ইউরোপে সাময়িকভাবে হলেও শান্তির পরিবেশ রচনা করেছিল। ঐতিহাসিক A.J.P.Taylor-এর মতানুসারে বলা যায় লোকার্নো চুক্তি ফ্রান্স, জার্মানি উভয় রাষ্ট্রকেই সন্তুষ্ট করেছিল। তাই এই চুক্তি ছিল কার্যতঃই একটি ভালো চুক্তি। লোকার্নো চুক্তিসমূহ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থের সমন্বয় সাধন করে। ফরাসী নিরাপত্তার বিষয়টি বহুল পরিমাণে সমাধানের পথে অগ্রসর হয়। জার্মানি জাতিসঙ্ঘের সদস্য পদ লাভ করে তার পরের বছর (১৯২৬)। ডেভিড টমসন এই

ইতিপূর্বে ১৯২২ সালে জার্মানি একটি প্রস্তাব পাঠিয়ে ছিল ফ্লান্সের পঁয়েকার মন্ত্রীসভার কাছে যাতে বলা হয়েছিল ব্রিটেন, বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং জার্মানি আগামী এক প্রজন্মের মতো সময়কালে পারস্পরিক যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু কট্টর পঁয়েকার মন্ত্রীসভা এই প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছিল। কিন্তু জেনেভা প্রটোকলের ব্যর্থতা ফ্রন্সের নিরাপত্তা সন্ধানের প্রয়াসকে অনেকখানি ব্যাহত করেছিল। লীগের অন্যতম সদস্য ব্রিটেনের অস্বীকৃতি এই জেনেভা প্রটোকলকে ব্যর্থ করে দেয়। ফ্রান্সও উপলব্ধি করেছিল লীগের মাধ্যমে নিরাপত্তার সন্ধান করা বৃথা হবে। গ্যাথর্ন হার্ডি বলেছেন "এটা স্পষ্ট যে যুদ্ধের পর পৃথিবীর শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক অবস্থার বিরুদ্ধে গ্যারাণ্টির আবশ্যকতা ছিল। লীগ ছোট ছোট বিবাদের মীমাংসা করলেও সংকট নিরসনের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছিল।" জার্মানির আক্রমণের বিরুদ্ধে রাইনল্যাণ্ড অঞ্চলে গ্যারাণ্টির প্রয়োজনীয়তা ছিল ফ্রান্সের। এই গ্যারাণ্টি বা নিশ্চিন্ততা দিতে পারত ব্রিটেন কিন্তু ব্রিটেন জেনেভা প্রটোকল গ্রহণে অসম্মতি জানালে ফরাসী নিরাপত্তার বিষয়টি ব্যাহত হয়। জেনেভা প্রটোকল ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে জার্মানির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক নিরাপত্তার সহায়ক হতে পারে। তাই ফ্রান্স ১৯২২ সালের জার্মান প্রস্তাবটি অর্থাৎ রাইনল্যাণ্ড অঞ্চলকে আগ্রাসন মুক্ত রাখার প্রস্তাবটিতে পুনর্বার বিবেচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। যাদিও ১৯২৩ সালে এই প্রস্তাব জার্মান পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার রাখা হয় কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। তবে ১৯২৪ সালের শেষ ভাগে বার্লিনে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত জানালেন উক্ত জার্মান প্রস্তাবটির পুনর্নবীকরণ প্রয়োজন। ব্রিটেনেও এই সময়ে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে ব্রিটেনে ক্ষমতাসীন হয়েছিল শ্রমিক দল এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী অসিট চেম্বারলেন নিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জার্মানির পশ্চিম সীমান্তের রাইন অঞ্চল অতিক্রম করে জার্মানি যাতে ফরাসী নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করে সেই ব্যাপারে ব্রিটেন ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি বা গ্যারাণ্টি দেয়। ডেভিড টমসন বলেছেন যে ফ্রাঙ্কো-জার্মানি বা ফ্রান্সের কারে আক্রমণ যাতে না হয় সেই ব্যাপারে গ্যারাণ্টি ব্রিটেন দিতে প্রস্তুত হয় ("Britain was prepared to guaranteo to France-German frontier against aggression by either Germany or France")।

৬.৮.২ লোকার্নো চুক্তির শর্তাবলী

এই ভাবে লোকার্নো চুক্তির ভিত্তিভূমি রচিত হয়। ১৯২৫ সালের প্রথমভাগে ইউরোপের রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনীতিকরা বিস্তারিত আলোচনার পর এক স্পষ্ট পরিকল্পনায় উপনীত হলেন। ফ্রাঙ্কো-জার্মান এবং বেলজিয়াম-জার্মান সীমান্ত আগ্রাসনের ব্যাপারে গ্যারাণ্টি লাভ করলো। জার্মানির যে সব অঞ্চলগুলির বে-সামরিকীকরণ করা হয়েছিল, যেখানে সৈন্য মোতায়েন ও দূর্গ নির্মাণ নিষিদ্ধ হয়েছিল সেখানেও গ্যারাণ্টি বা নিশ্চিন্ততা প্রদান করা হয়। এই ব্যাপারে অতিরিক্ত রাষ্ট্র হিসাবে ইতালিও গ্যারাণ্টি বা নিশ্চিন্ততা প্রদান করা হয়। আরো স্থির হয় লীগ অফ নেশনসে স্থীয় সদস্য রূপে জার্মানি যোগ দেবে। তবে জার্মানির পূর্ব সীমান্ত সম্পর্কে কোন গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়নি।

৬.৮.৩ লোকার্নো চুক্তির সমস্যা

তবে এর ফলে কিছু অসুবিধা বা সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমত, ভার্সাই সন্ধি অনুযায়ী পশ্চিম সীমান্ত মানতে জার্মানি রাজী হলেও, পূর্ব সীমান্ত মানতে সে স্বীকৃত ছিল না। অর্থাৎ জার্মানির সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড সীমান্ত নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সালিসি চুক্তির মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয়।

যে নিরস্ত্রীকরণের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছিল বার বার। অন্যপক্ষে জাতিসঙ্ঘকে প্রকৃত কার্যকরী করে তুলতে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এত কুণ্ঠা ছিল যে নিরস্ত্রীকরণকে বাস্তবায়িত করা যায়নি।

৬.৮ লোকার্নো অধিবেশন (১৯২৫)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি, স্থায়িত্ব, নিরস্ত্রীকরণ এবং নিরাপত্তার বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। তাই দেখা যায় শান্তি ও স্থায়িত্ব রক্ষার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হল। বস্তুতপক্ষে নিরাপত্তার প্রশ্নে সর্বাপেক্ষা বেশি আশঙ্কিত ও আগ্রহী ছিল ফ্রান্স। ই. এইচ. কার-এর মতানুসারে বলা যেতে পারে দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয় বিষয় ছিল ফ্রান্সের নিরাপত্তার জন্য দাবী। ১৯২৫ সালে স্বাক্ষরিত লোকার্নো চুক্তি ছিল নিরাপত্তা নিরস্ত্রীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে গৃহীত প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস।

৬.৮.১ লোকার্নো অধিবেশনের পটভূমি

জেনেভা প্রটোকলের ব্যর্থতা কিয়দংশে লোকার্নো চুক্তির ভিত্তি রচনা করেছিল বলা যেতে পারে। এছাড়া ছিল নিরাপত্তার জন্য ফ্রান্সের ঐকান্তিক আগ্রহ। কারণ পরাজিত জার্মানির প্রতিশোধমূলক কার্যকলাপের আশঙ্কায় ফ্রান্স সর্বদাই ভীতিগ্রস্ত ছিল। এই ভীতি থেকে এসেছিল নিরাপত্তাহীনতা। ফরাসী নিরাপত্তাহীনতার প্রতি ব্রিটেনের উদাসীনতা ও আমেরিকার নিষ্ক্রিয়তা ফ্রান্সকে চিন্তান্বিত করে তুলছিল। অপর দিকে জার্মানির কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন লোকবল, অর্থবল, ঐতিহ্য প্রভৃতি ফ্রান্সের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। মনে করা হত যে জার্মানির শক্তির ভিত্তি অটুট ছিল। তাই পরাজিত জার্মানিকে ফ্রান্স কখনোই শক্তিহীন বলে মনে করতে পারেনি। তাই ফ্রান্স কখনোও একক প্রয়াস চালিয়েছে, কখনোও বা সমঝোতার ভিত্তিতে নিজের নিরাপত্তার প্রশ্নটির সমাধানে ব্রতী হয়েছে। একক প্রয়াসের ক্ষেত্রে ফ্রান্স, যুগোশ্লোভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়া কর্তৃক নির্দিষ্ট লিটল আঁতাতের বা ক্ষুদ্র আঁতাতে যোগদানের কথা বলা যায়। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এইভাবে ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যেন এক নিরাপত্তার বৃত্ত বা বলয় সৃষ্টি করেছিল। ডেভিড টমসনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা যায় "Thus it was she who linked the western settlement with eastern by making network of alliances with Poland and of agreements with 'Little Entente' powers of Yugoslavia, Czechoslovakia and Rumania"। এই ক্ষুদ্র মৈত্রী চুক্তি ফরাসী নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে পারেনি। উপরন্তু মৈত্রীবদ্ধ রাষ্ট্রগুলিতে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ছিল। ফ্রান্স চুক্তিবদ্ধ থাকার কারণে এই সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লে ফ্রান্সের সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতা যুগপৎ বৃদ্ধি পায়। সমকালীন ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়। কট্টর জার্মান বিরোধী পঁয়েকার মন্ত্রীসভা ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং হেরিয় (Heerioe) প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন। তিনি ছিলেন অনেক উদার মনোভাবাপন্ন। ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিয়াঁ (Briond) জার্মানির প্রতি সমঝোতাপূর্ণ নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যদিকে জার্মান চান্সেলার স্ট্রেসিমান জার্মানির পররাষ্ট্র নীতিতে সংঘাতের পথ পরিত্যাগ করেন এবং সহাবস্থান ও স্থিতাবস্থা হয়ে উঠে সমকালীন জার্মানির পররাষ্ট্র নীতির বৈশিষ্ট্য। তাই উভয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন নিরাপত্তা সমস্যা সমাধানে এক অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ফ্রান্স তার প্রধান প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা ও সহাবস্থান নীতি অনুসরণ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতি লোকার্নো চুক্তির পটভূমি প্রস্তুত করেছিল।

কামান, বোমারু বিমান, ট্যাঙ্ক এবং রাসায়নিক অস্ত্র (পরমাণু বোমা) বিলুপ্ত করা হবে। ভারী ও বৃহতের পরিবর্তে ক্ষুদ্র ও হালকা অস্ত্র রাখা স্বীকৃত হয়। এই প্রস্তাবে ছোট রাষ্ট্রগুলি সম্মত হয়। ব্রিটেন এই প্রস্তাবে রাজী হয়নি। এবং ফ্রান্স পুনরায় নিরাপত্তার প্রশ্নটি উত্থাপন করে। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়নি এবং ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে স্থগিত হয়ে যায়। পুনরায় যখন ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনেক বেশি জটিল ও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। প্রথমত, জাপান জার্মানি জাতিসঙ্ঘ বিরোধী হয়ে উঠেছিল। জার্মানি নাৎসী অধিনায়কত্বে পুনরায় সামরিকীরণ শুরু করেছিল। এই পরিস্থিতি ফ্রান্সের নিরাপত্তা হীনতার মনোভাবকে আরও বর্ধিত করে।

ফ্রান্স উপলব্ধি করে যে শুধুমাত্র জার্মানির বিপরীতে তার সামরিক শক্তির সঙ্গে যদি শিল্প ও মানব সম্পদ বৃদ্ধি হয় তবে তার আধিপত্য বজায় থাকবে।

ব্রিটেন এই সময়ে একটি সম্মেলন আহ্বানের খসড়া প্রস্তুত করে। তাতে প্রস্তাব করা হয় সৈন্য (effectives), বিমান প্রভৃতির সংখ্যা হ্রাস করার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাম্যমান কামান (mobile guns by caliber 4) এবং দশ টন ওজনের বেশি ভারী ট্যাঙ্ক প্রভৃতির সংখ্যা কমিয়ে ফেলা হবে।

জার্মানিকে সন্তুষ্ট করতে বলা হয় ভার্সাই সম্মেলনে গৃহীত নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা বিষয়ে এই সম্মেলনে আলোচনা করা হবে। এছাড়া জার্মানিকে সৈন্য রাখার অনুমতিও দেওয়া হয়। বলা হয় অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির দেশের ভিতর যা সৈন্য থাকবে তার সমপরিমাণ সৈন্য জার্মানিও রাষ্ট্রের ভিতর রাখার অনুমতি পাবে। এই ব্যবস্থা দেখাশুনার জন্য একটি স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণ কমিশনও গঠিত হয়। এই প্রস্তাবে ফ্রান্সের জন্য অতিরিক্ত গ্যারান্টিও দেওয়া হয়। এতদসত্ত্বেও প্রকৃত নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব হয়নি। এই সম্মেলন জুন মাসে স্থগিত হয়ে অক্টোবর মাসে পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়।

অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ফ্রান্স, ব্রিটিশ পরিকল্পনায় কিছু সংশোধনের প্রস্তাব দেয়। ফরাসী পরিকল্পনাতে বলা হয় প্রথম চার বছর একটি আন্তর্জাতিক পরিদর্শক সংস্থা বিভিন্ন দেশের সামরিক সরঞ্জাম পরিদর্শন করবে। এই চার বছর কেউ অস্ত্র বৃদ্ধি করবে না। যদি চার বছরের এই সময় কাল সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রান্ত হয় তখন প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণ শুরু হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ফরাসী প্রস্তাব জার্মানির মূল দাবীকে এড়িয়ে গিয়েছিল।

ফ্রান্সের এই প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ইটালী সমর্থন করে। ব্রিটিশ প্রতিনিধি সাইমন ১৯৩৩ সালের ১৪ই অক্টোবর সম্মেলন একটি নতুন প্রস্তাব পেশ করার কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি টেলিগ্রাম মারফত বার্লিন থেকে জানানো হয় জার্মানি এই সম্মেলন পরিত্যাগ করেছে। ওই একই দিনে আরও কিছু পরে জার্মানি জাতিসংঘ থেকে নিজ সদস্য পদ প্রত্যাহার করে নেয়। যদিও সঙ্গে সঙ্গে এই নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন সমাপ্ত হলো না কিন্তু এর যাবতীয় প্রস্তাব, পরিকল্পনা যে বাস্তবায়িত হবে তার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৪ সালের মধ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা খাতে রাষ্ট্রীয় বাজেট বৃদ্ধি পায়।

এইভাবে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন যে সাফল্য লাভ করতে পারে না তা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এই প্রসঙ্গে Walter বলেছেন "While all agreed that the Conference must adjourne, no body proposed that it should close for ever. It was characteristics of League of Nations that it was never ready of confess defeat in any important purpose."

তাই উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে প্রকৃত প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উদ্দেশ্যের এতটাই স্ববিরোধীতা ছিল

বহন ক্ষমতা নির্ধারণের পক্ষে মত প্রকাশ করে। সুতরাং নৌ-বহরের বহন ক্ষমতার ব্যাপারে সহমত হওয়া সম্ভব হ'ল না। তৃতীয় মতপার্থক্য দেখা দিল আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে। কারণ ফ্রান্স এই বিষয়ে অতি উৎসাহী হলেও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেনি।

উপরিউক্ত জটিলতা ব্যতিরেকে আরো বহুবিধ মতভেদ ছিল বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে। প্রস্তুতি কমিশনের অধিবেশনে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মতভেদ ছিল সার্বিক। নিরস্ত্রীকরণ, সামরিক ব্যয় হ্রাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদের নিরসন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

সুতরাং E. H. Carr-কে অনুসরণ করে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত আলোচনা প্রস্তুতি কমিশন নিয়োগের মাধ্যমে সম্পাদনের যে প্রয়াস শুরু হলো তার বাস্তব প্রয়োগ নানাবিধ সংকটের কারণে অসম্ভব হবে উঠল। বস্তুতপক্ষে এই সমস্ত প্রয়াসই যেমন আলোচনার মাধ্যমে বিবাদের নিষ্পত্তি, যুদ্ধ প্রতিরোধ কল্পে নব নব পদ্ধতির উদ্ভাবন—ছিল তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা, কারণ ইতিপূর্বেই সম্পাদিত হয়ে গিয়েছে লোকার্নো চুক্তি। এই চুক্তি রচনা করেছিল শান্তি ও সৌহার্দ্যের পরিমণ্ডল।

৬.৭.১ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা, সাফল্য ও মূল্যায়ন

১৯৩০ সালের পঞ্চশক্তি নৌ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর জাতিসঙ্ঘ নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে আরো বেশি প্রয়াসী হয়। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি খসড়া সম্মেলন প্রস্তুত করা হয় যাতে সংযুক্ত হয় নানাবিধ সংরক্ষিত বিষয়। এই খসড়া সম্মেলনে বলা হয় যে বহু প্রতীক্ষিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে জেনেভায় ১৯৩২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি।

সম্মেলনে তিনটি বিষয় রাষ্ট্রনেতৃবর্গের যাবতীয় আশা আকাঙ্খাকে অসম্ভব ও অবাস্তব করে তোলে। **প্রথমত,** জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ; **দ্বিতীয়ত,** জার্মানিতে নাৎসীবাদের উত্থান ; **তৃতীয়ত,** পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক দুর্দশা।

প্রস্তুতি কমিশনের সম্মুখে সমস্যাগুলির কোন সমাধান সম্ভব ছিল না। কারণ জার্মানির দাবী ছিল সমতার নীতি প্রতিষ্ঠা করা হোক অন্যদিকে ফ্রান্স নিরাপত্তার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিল। তাই ফরাসী সমরমন্ত্রী Tardieu একটি নতুন পরিকল্পনা পেশ করেন। এই পরিকল্পনায় বলা হ'ল—

প্রথমত, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও বিপজ্জনক অস্ত্রশস্ত্র যেমন বোমারু বিমান, ভারী বন্দুক, রণতরী প্রভৃতিকে একবারে বাদ দিতে হবে ;

দ্বিতীয়ত, জাতি সঙ্ঘের অধীনে আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রাখতে হবে ;

তৃতীয়ত, সালিসি ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে ;

চতুর্থত, নিরস্ত্রীকরণনীতি ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি কার্যকরী সংস্থা গঠন করা।

ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ফরাসী পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যান করে, এই কারণে যে এই পরিকল্পনা যে কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপ করবে। তাছাড়া এই পরিকল্পনায় জার্মানির দাবী (সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য জার্মানি দাবী জানিয়ে আসছিল) তার উপরও কোন আলোকপাত করা হয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন এরপর নিরস্ত্রীকরণের গুণগত (Qualitative Disarmament) দিকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে। গুণগত নিরস্ত্রীকরণ হ'লো সেই সব অস্ত্রশস্ত্র নিশ্চিহ্ন করা যা আক্রমণাত্মক প্রকৃতির। তবে এখানে আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কোনরূপ করা হয়নি।

এই সম্মেলনে নিরস্ত্রীকরণের কৌশলগত বিষয়গুলির উপর বিতর্ক শুরু হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি হুভার প্রস্তাব করেন বিশেষ আক্রমণাত্মক অস্ত্রগুলি নিশ্চিহ্ন করা হবে এবং বাকি অস্ত্রের এক তৃতীয়াংশ হ্রাস করা হবে।

that the problem was one of far greater simplicity than that confronting the League of Nations in relation to the land forces of Europe."

৬.৬.২ ওয়াশিংটন সম্মেলনের সীমাবদ্ধতা

ওয়াশিংটন সম্মেলনে জাপানের নৌ-শক্তির আয়তন ও সংখ্যা সীমিত করা হয়। জাপান একপ্রকার বাধ্য হয়ে তা মেনে নিয়েছিল। এই সময়কার অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি জাপানকে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করে। ব্রিটেন, আমেরিকা ছিল তৎকালীন বিশ্বরাজনীতির কেন্দ্র। তাই দুটি রাষ্ট্রের যৌথ প্রয়াসের বিরুদ্ধাচারণ জাপানের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠত। কিন্তু পরবর্তীকালে জাপান ব্রিটেন ও আমেরিকার নৌ-বাহিনীর সঙ্গে সমতা দাবী করে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং ১৯৩৬ সালে জাপান এই চুক্তি নাকচ করে। ওয়াশিংটন সম্মেলনের মাধ্যমে নৌ-শক্তিতে বলীয়ান জাপানকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা তৎকালীন পরিস্থিতিতে সাফল্য লাভ করেছিল ঠিকই কিন্তু এই সাফল্য জাপানের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। জাপানের আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণের সময়কালে এই চুক্তি পরিত্যক্ত হয়।

৬.৬.৩ সম্মেলনের গুরুত্ব

তাই এই সম্মেলনের সাফল্য ছিল তাৎক্ষণিক এবং সাময়িক সাফল্য সত্ত্বেও এর গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দূর প্রাচ্যের রাজনীতিতে জাপান অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলে যে ভারসাম্য হীনতার সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রশমনের ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন সম্মেলন কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল। পরবর্তী এক দশক কাল সুদূর প্রাচ্যে শান্তি ও ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছিল।

৬.৭ প্রস্তুতি কমিশন : সমস্যা

ওয়াশিংটন সম্মেলনে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ তাদের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতেই আগ্রহী ছিল বেশি এবং জাপানের সাম্রাজ্যবাদী প্রসার প্রতিহত করাতে উৎসাহী ছিল। ফলে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে অযথা কালক্ষেপ শুরু হয়। এই সময়ে লীগ অফ নেশনের ভিতর থেকে লীগ কাউন্সিল সদস্য রাষ্ট্রগুলির অস্ত্রশস্ত্র সীমিত করার জন্য একটি প্রস্তুতি কমিশন গঠন (Preparatory Commission) করে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং এই কমিশনের প্রথম বৈঠক বসে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে। এই বছর সোভিয়েত রাশিয়া, জার্মানি এবং আমেরিকা প্রস্তুতি কমিশনে যোগ দেয়।

প্রস্তুতি কমিশন প্রাথমিক পর্বে তিনটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। এই প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মতৈক্যের অভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনটি প্রশ্ন ছিল **প্রথমত,** সৈন্যদের সংজ্ঞা নির্ধারণ নিয়ে; **দ্বিতীয়ত,** নৌ-বাহিনীর বহন ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ নিয়ে ; **তৃতীয়ত,** আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী গঠন করার বিষয়ে মতভেদ প্রকট হয়ে উঠল। প্রথম জটিলতা ছিল রাষ্ট্রের প্রকৃত সেনাবাহিনী কারা সেই প্রশ্নে অর্থাৎ ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্র কর্মরত সৈন্যদের 'সৈন্য' সংজ্ঞার আওতাভুক্তিতে আগ্রহী ছিল এবং ইংল্যান্ড, জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্র প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৈন্যদেরও হিসাবের মধ্যে নিয়ে আসার দাবি করে। সুতরাং 'সৈন্য' সংজ্ঞা ভুক্ত করা হবেন?—এই নিয়ে মতানৈক্য শুরু হয়। দ্বিতীয় জটিলতা ছিল বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির নৌ-বাহিনীর বহন ক্ষমতা বিষয়ক। ব্রিটেন ও আমেরিকা পৃথকভাবে বহন ক্ষমতা স্থির করার পক্ষে এবং ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি নৌ-বহরের মোট

৬.৬ পূর্ব এশিয়ার ভারসাম্য বিঘ্নকারী রূপে জাপান

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই জাপান দূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ১৯০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ, জাপানকে এক অপ্রতিহত গতি দান করেছিল। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দুর্বার নৌ-শক্তি রূপে জাপান আত্মপ্রকাশ করে। চীনের কিয়াও-চাও, শানটুং প্রদেশ, তাছাড়া ফরমোজা, শাখা লিন, কোরিয়া অঞ্চল জাপানের পদানত ছিল। এইভাবে জাপানের অগ্রগতি দূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করছিল। অন্যদিকে ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে আমেরিকা দূর প্রাচ্যে বিশেষ স্বার্থ সাধনে তৎপর হয়ে উঠেছিল। হাওয়াই ও ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের অধিকার আমেরিকাকে চীন সাম্রাজ্যে ভালোভাবে প্রবেশের সুযোগ দিয়েছিল। প্রাচ্য রাষ্ট্র জাপান চীনে নিজ স্বার্থ সিদ্ধিতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল। চীনের সমৃদ্ধ মাঞ্চুরিয়া অধিকার করার চেষ্টা জাপান ও আমেরিকা উভয়েই চালিয়ে যাচ্ছিল। এই অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ে সক্ষম হয় জাপান। এছাড়া জাপানের সামরিক তথা নৌ-শক্তি বৃদ্ধি আমেরিকা ভীত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। প্রাচ্যে চীন থেকে ফুকেন (Fukien) পর্যন্ত সর্বপ্রকার নৌ-তৎপরতা জাপান নিয়ন্ত্রণ করতো। ঐতিহাসিক Vinacke বলেছেন "By 1921 Japan was in a position strategically, to dominate the East. All of the sea approaches from north to south were controlled by her"। জাপানের এই প্রাচ্য অভিযান স্বভাবতই আমেরিকার মনঃপুত ছিল না। তাই প্রাচ্যের উভয় শক্তির সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে নৌ-শক্তি দমনের জন্য তাই ওয়াশিংটন সম্মেলন আহুত হয়। 'The Washington Conference originated out of a desire, in the interest of economy, to reduce naval armament"।

৬.৬.১ ওয়াশিংটন সম্মেলন (১৯২১-২২)

পূর্ব এশিয়ায় যে সব রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ জড়িয়ে ছিল সেই দেশগুলির প্রতিনিধিরাই ওয়াশিংটন সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এই রাষ্ট্রগুলি হল আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, চীন, ইতালি, বেলজিয়াম, হল্যান্ড এবং পর্তুগাল। এখানে সম্পাদিত হ'ল তিন প্রকার চুক্তি। চতুর্শক্তি চুক্তি, পঞ্চশক্তি চুক্তি এবং নয়শক্তি চুক্তি। চতুর্শক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে। চুক্তিতে স্থির হয় যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক অধিকার মেনে চলবে ও অধিকার সম্পর্কিত মতবিরোধ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে।

পঞ্চশক্তি চুক্তিটি ছিল নৌ-নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান ও ইতালির মধ্যে। দূর প্রাচ্যে জাপানের নৌ-বল হ্রাস করার জন্য বলা হয় ভারী যুদ্ধ-জাহাজের ক্ষেত্রে জাপানের নৌ-শক্তি, ব্রিটিশ ও মার্কিন নৌ-শক্তির শতকরা ষাটভাগ হবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ব্রিটিশ ও মার্কিন নৌ-শক্তির হার সমান হবে বলে স্থির হয়।

তৃতীয় চুক্তি অর্থাৎ নয়শক্তি চুক্তিটি ছিল চীন সম্পর্কিত নয়টি রাষ্ট্র—ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ড, পর্তুগাল, বেলজিয়াম ও জাপানের মধ্যে এই নয়শক্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি চীনের অখন্ডতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চীনে কোন বিদেশী শক্তি হস্তক্ষেপ করবে না স্থির হয় এবং চীনের সর্বত্র শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে সুবিধা দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়। বস্তুতপক্ষে এই চুক্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের সম্মান বৃদ্ধি করেছিল। ঐতিহাসিক গ্যাথর্ন হার্ডি তাই বলেছেন "In these circumstances, while the achievement was substantial, it is obvious

প্রচেষ্টা জেনেভা প্রটোকলে পরিলক্ষিত হয়। লীগ পরিষদকে ত্রুটি মুক্ত করা ও লীগকে শক্তিশালী করে তোলার এটাই ছিল প্রচেষ্টা। জেনেভা প্রটোকল নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের আহ্বানের ব্যবস্থা করেছিল। এই ব্যবস্থা লীগ চুক্তিপত্রে ছিল না। জেনেভা প্রটোকল ১৯১৯ সালের রাষ্ট্রীয় পুনর্বিন্যাস অক্ষুন্ন রাখার ওপর জোর দিয়েছিল। এছাড়া শান্তি ব্যবস্থার সঙ্গে নিরাপত্তার প্রশ্নটিও যুক্ত রাখার প্রবনতা এই প্রটোকলে পরিলক্ষিত হয়েছিল।

৬.৫.৩ জেনেভা প্রটোকলের ব্যর্থতার কারণ

আইন সংগত ভাবে পৃথিবীতে শান্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠায় জেনেভা প্রটোকল ছিল সত্যিই এক সাহসী ও সুচিন্তিত প্রয়াস। তবে অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও সাফল্য লাভ করতে পারেনি। ঐতিহাসিক কার (E. H. Carr)-এর মন্তব্য অনুসরণ করে বলা যায় লীগ কভেনান্টে সন্নিবিষ্ট ১৬নং ধারা অনুযায়ী লীগ কাউন্সিলের যে ক্ষমতা ছিল তাকে সুদৃঢ় করার কিংবা আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে জেনেভা প্রটোকল সফল হতে পারেনি। ফলে লীগের ষোড়শ ধারাটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং সর্বশেষে বলা যায় যে জেনেভা প্রটোকলে কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিপদে হস্তক্ষেপের উল্লেখ ছিল, তাই অনেক রাষ্ট্র এটিকে তাদের সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপ রূপে গণ্য করতে থাকে। তবে ত্রুটিগুলি সংশোধনের সম্ভাবনা থাকলেও ব্রিটেন ও ব্রিটিশ ডোমিনিয়ানগুলিতে জেনেভা প্রটোকলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়। ১৯২৪ সালের নভেম্বর মাসের নির্বাচনে ব্রিটেনে ম্যাকডোনাল্ড শ্রমিক সরকারের স্থলে ক্ষমতা লাভ করে বলডুইনের রক্ষণশীল দল। ১৯২৫ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী অস্টিন চেম্বারলেন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে এই প্রটোকল গ্রহণ করা ব্রিটেনের পক্ষে সম্ভব নয়। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির বিরোধিতার ফলে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

৬.৫.৪ জেনেভা প্রটোকলের তাৎপর্য

জেনেভা প্রটোকল ব্যর্থ হলেও ইউরোপের যে কোন স্থানের শান্তি বিঘ্নিত হলে তার প্রতিরোধ করাও সেজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন অনিবার্য হয়ে ওঠে। গ্যাথর্ন হার্ডি তাই যথার্থই বলেছেন যে পৃথিবীর শান্তি ভঙ্গকারী বিপদগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল ("It remained evident and universally agreed that some form of guarantees against the main dangers threatening European peace was indispensible")। লীগ চুক্তিপত্রের অষ্টম ও নবম ধারায় নিরস্ত্রীকরণের নীতি সন্নিবিষ্ট ছিল এবং এর দায়িত্ব লীগের ওপর বর্তায়। তবে নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা লীগের বাইরেও গৃহীত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে নিরস্ত্রীকরণের লীগ বহির্ভূত প্রচেষ্টা হিসাবে ওয়াশিংটন সম্মেলনের কথা উল্লেখ করা যায়। নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের একটি উল্লেখনীয় পদক্ষেপ ছিল এই ওয়াশিংটন সম্মেলন, এটি পূর্ব এশিয়ার রাজনীতির জটিলতা নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। বস্তুতপক্ষে জাতিসংঘ কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা ও পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য কোন সম্মেলন আহ্বান করার পূর্বেই ১৯২১ সালের ১১ই আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হার্ডিঞ্জ নৌ-শক্তি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিশ্বের প্রধান প্রধান নৌ-শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রগুলিকে এক সম্মেলনে আহ্বান করেন। এই সম্মেলন চলেছিল ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে নৌ-শক্তি হ্রাস করার জন্য ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান চুক্তি স্বাক্ষর করে।

প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী হেরিয়ট লীগের সভায় উপস্থিত হয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে মীমাংসার জন্য একটি দলিল বা প্রটোকল প্রস্তুত করার জন্য লীগ সদস্যদের অনুপ্রাণিত করেন এবং এর ফলে লীগের সাধারণ সভার পঞ্চম অধিবেশনে "Protocol for the pacific settlement of international disputes" নামে একটি দলিল পেশ করা হয়। তবে এই দলিলটি জেনেভা প্রটোকল নামেই পরিচিত।

৬.৫.১ জেনেভা প্রটোকলের উদ্দেশ্য

জেনেভা প্রটোকল সালিসি (arbitration), নিরস্ত্রীকরণ (disarmament) ও নিরাপত্তা (security) এই তিনটি নীতি বা উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখে লীগের দুর্বলতাগুলিকে দূর করতে প্রয়াসী হয়েছিল। লীগের প্রধান দুর্বলতাই ছিল যুদ্ধ প্রতিরোধের ব্যাপারে। লীগ অফ নেশনসের কভেন্যান্ট বা চুক্তিপত্র যুদ্ধের পথ নিষিদ্ধ করতে পারেনি। রাষ্ট্রসঙ্ঘ কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিবাদে হস্তক্ষেপ করতে অপারগ ছিল এবং কোন প্রস্তাব পাশ করানোর ক্ষেত্রে সদস্যদের ঐক্যমত স্থাপনেও সক্ষম ছিল না। জেনেভা প্রটোকল লীগের এই শূন্যস্থান দুটি পূরণ করতে প্রয়াসী হয়েছিল। ঐতিহাসিক E. H. Carr লিখেছেন "The covenant left the door open for war, not only in cases when the Council voting without the parties failed to pronounce a unanimous judgement on a dispute, but also in cases where the subject of the dispute was ruled to be a matter within the domestic jurisdiction of one of the partiers. The protocol sought to close these two "gaps". প্রটোকলের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি কোন অবস্থাতেই যুদ্ধে লিপ্ত হবে না বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। সবরকম বিবাদে রাষ্ট্রবর্গ আন্তর্জাতিক আদালতের সাহায্য নিতে বাধ্য থাকবে। লীগ কাউন্সিল কোন বিষয়ে ঐক্যমত স্থাপন করতে না পারলে একটি সালিসি কমিটি নিযুক্ত করে বিবাদের বিষয়টিকে কমিটিতে পাঠাতে হবে এবং কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে। রাষ্ট্র বিরোধের ক্ষেত্রে লীগ কাউন্সিলের বাধ্যতামূলক সালিসি, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ পন্থা গ্রহণে যে রাষ্ট্র অসম্মত হবে তাকে আক্রমণকারী দেশ বলে অভিহিত করা হবে।

লীগের দ্বিতীয় শূন্যস্থানটি পুরণের জন্য প্রটোকলের বিধান ছিল যে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিবাদের যুক্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য প্রটোকলের এগারো নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র সঙ্ঘের যে কার্যপ্রণালী তা মেনে নিতে হবে। জেনেভা প্রটোকলের অন্যতম বিশেষত্ব হ'ল যে এরপর থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিবাদে লীগ পরিষদ প্রয়োজনবোধে হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

সুতরাং জেনেভা প্রটোকল দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিল—**প্রথমত,** আক্রমণকারী রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করতে পেরেছিল ও **দ্বিতীয়ত,** ভবিষ্যত আক্রমণ বোধ করতে প্রয়াসী হয়েছিল। জেনেভা প্রটোকলের অন্যতম শর্তটি ছিল নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করা। কারণ, নিরাপত্তা ও সমরাস্ত্র হ্রাসের পরস্পর বিরোধী নীতি নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। তাই প্রটোকল প্রস্তাব করে যদি ১৯২৫ সালের ১৫ই জুনের পূর্বে অধিকাংশ রাষ্ট্র জেনেভা প্রটোকল আইন সিদ্ধ করে নেয় তবে ১৫ই জুন নিরস্ত্রীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অধিবেশন আহুত হবে।

৬.৫.২ জেনেভা প্রটোকলের প্রচেষ্টা

বস্তুতপক্ষে জেনেভা প্রটোকলে লীগ কভেনান্টের কয়েকটি আইনসংগত ত্রুটি দূর করার প্রয়াস দেখা যায়। আক্রমণের সম্ভাবনা যথাসম্ভব দূর করে স্থায়ী শান্তির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি করার

তাই বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে জার্মানির নিরস্ত্রীকরণ সম্পূর্ণ হবার পর মিত্রপক্ষ জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ন্যূনতম সমরসজ্জা বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করে। এই দুই পরস্পর বিরোধী নীতির সংঘাত নিরস্ত্রীকরণে সমস্যা সৃষ্টি করে। তবে এটি ছিল নিরস্ত্রীকরণের প্রত্যক্ষ পদ্ধতি। যার অর্থ হল অস্ত্র হ্রাস করলে নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। যা স্বীকার করেছিল ব্রিটেন ও তার সহযোগী রাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইটালী। কিন্তু ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড ইত্যাদি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির দাবী ছিল প্রথমে নিরাপত্তা পরে নিরস্ত্রীকরণ।

৬.৪ নিরস্ত্রীকরণের প্রয়াস

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের জন্য লীগের পক্ষ থেকে প্রথম দিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে (statistical and mathematical basis) নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস চালান হয়। তবে এই প্রচেষ্টা সমরসজ্জার প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। প্রথমে স্থল, নৌ ও বায়ু সেনাদের মধ্যে থেকে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি স্থায়ী উপদেষ্টা কমিশন গঠিত হয় (Permanent Advisory Commission)। লীগ চুক্তিপত্রের নবম অনুচ্ছেদ অনুসারে স্থায়ী উপদেষ্টা কমিশন গঠনের ন'মাস পরে গঠিত হয় অস্থায়ী মিশ্র কমিশন, মে, ১৯২০। এই কমিশন বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করতে থাকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমরাস্ত্রের পরিমাণ সম্পর্কে এবং এই ক্ষেত্রে অনেকটা সময় ব্যয় করার পর সুপারিশ করে যে প্রাথমিক নিরস্ত্রীকরণের শর্ত প্রতিটি রষ্ট্রই পূরণ করবে এবং তা সেই রাষ্ট্রের জাতীয় বাজেটের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। নিরাপত্তার প্রয়োজনে যে ন্যুনতম অস্ত্র রাখা হবে তা রাষ্ট্রের জাতীয় আয় ব্যয়ের হিসাবের উর্ধ্বে যেন না হয়। অস্থায়ী মিশ্র কমিশনের ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড এশার (Lord Esher) একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। গ্যার্থেন হার্ডির মতে এটিও ছিল গাণিতিক ধরনের অর্থাৎ mathematical type-এর। লর্ড এশার প্রস্তাব দেন প্রতিটি রাষ্ট্র নির্দিষ্ট (৩০,০০০) সৈন্য রাখতে পারবে। ত্রিশ হাজার সেনা নিয়ে একটি ইউনিট গঠন করার প্রস্তাবানুসারে স্থির হয় যে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও ইটালী যথাক্রমে ছয়, তিন ও চার ইউনিট সেনাবাহিনী রাখতে পারবে। তবে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে এবং সমরবাহিনী হ্রাসের প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়।

৬.৫ জেনেভা প্রটোকল

নিরস্ত্রীকরণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে লীগ কাউন্সিল গঠন করেছিল Temporary Mixed Commission for Disarmament। ১৯২৩ সালে এই অস্থায়ী মিশ্র কমিশন একটি পারস্পরিক সহায়তা সন্ধি'র (Draft Treaty of Mutual Assistance) খসড়া উপস্থিত করে, যাতে ভবিষ্যতে নিরস্ত্রীকরণের উল্লেখ করা হয়। তবে নিরস্ত্রীকরণের বিষয়টি খুব স্পষ্ট করে বলা ছিল না। তবে নিরাপত্তা সম্পর্কে নির্দিষ্ট গ্যারান্টির কথা বলা হয়েছিল। ফ্রান্স উৎসাহের সঙ্গে এই খসড়া চুক্তি মেনে নিয়েছিল। অন্যদিকে গ্রেট ব্রিটেন, হল্যান্ড, ব্রিটিশ ডোমিনিয়নস্থ রাজ্যগুলি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। দেখা গেল লীগ অফ নেশনসের প্রধান সদস্যদের মধ্যে দুটি পৃথক মনোভাব বিরাজমান। ফ্রান্স ও তার সমর্থক রাষ্ট্রবর্গ লীগকে নিরাপত্তা বৃদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে আগ্রহী ছিল, অপরপক্ষে ব্রিটেন ও ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রগুলি লীগকে আলাপ-আলোচনাও পরামর্শের জন্য একটি ব্যবহারযোগ্য সংস্থা হিসাবে গণ্য করতো। প্রকৃতপক্ষে নীতির সংঘাত নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সৃষ্টি করে—মত পার্থক্যের কারণে 'পারস্পরিক সহায়তা সন্ধি' কার্যকরী হতে পারেনি। ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ

রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সহযোগিতাই লীগের দক্ষতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, সদস্য রাষ্ট্রগুলির সুরক্ষা বৃদ্ধি করতে পারে এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ বৃদ্ধি করবে, তাই রাষ্ট্রগুলি যদি নিরস্ত্রীকরণে সহমত হয় তবেই যুদ্ধভীতি দূরীভূত হবে। এজন্য শুধু জার্মানি নয় ইউরোপের সব রাষ্ট্রগুলিকেই সমর উপকরণ হ্রাস বা বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা রদ করতে হবে। তা না হলে সীমান্ত যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে এবং সমগ্র ইউরোপ তার ফলে পুনরায় জড়িয়ে পড়বে। তাত্ত্বিক ভাবে বলা যায় যে নিরস্ত্রীকরণ হ'ল সমরাস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান। নিরস্ত্রীকরণের অর্থ হচ্ছে যাবতীয় সমরাস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করা কিংবা বন্ধ করে দেওয়া। প্রচলিত ধারণানুসারে রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গ মনে করতেন ক্ষমতার লড়াই নিশ্চিহ্ন করতে পারলে আন্তর্জাতিক নৈরাজ্য বা যুদ্ধ এড়ানো যাবে। এই ধারণা থেকেই ভার্সাই শান্তি চুক্ততে নিরস্ত্রীকরণ নীতি সংযুক্ত করা হয়েছিল। কারণ ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমরসজ্জা বৃদ্ধি করে। এই বর্ধিত সমরাস্ত্র হ্রাস করার বা নিশ্চিহ্ন করণের নীতিই হলো নিরস্ত্রীকরণ নীতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরই নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে কোন গম্ভীর সমস্যা উপলব্ধি করা যায়নি। কিন্তু ভার্সাই চুক্তির মধ্যেই নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে 'সমস্যা' দেখা যায়। ভার্সাই চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে জার্মানির সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি তাদের সমরসজ্জা কমিয়ে আনবে এবং জাতিসঙ্ঘের চুক্তিপত্রের আট নম্বর ধারায় একথা স্বীকৃত হয়েছিল যে, "শান্তি রক্ষার্থে প্রয়োজন জাতীয় অস্ত্র হ্রাসের পরিমাণ একেবারে ন্যূনতম করে ফেলা এবং তা নিয়োজিত হবে সুরক্ষায়" ["that the maintainence of peace required the reduction of National armament to the lowest point consistent with National safety"]।

নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে একপক্ষে একটি সর্বসম্মতিক্রমে অস্ত্র হ্রাসের আশ্বাস (general promise) দেওয়া হয়েছিল এবং অন্য পক্ষে ছিল জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি যা বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির নেতৃবর্গের কাছে সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছিল। তাই নিরস্ত্রীকরণের আশ্বাস ও জাতীয় নিরাপত্তা স্থাপনের বিষয়টির অগ্রাধিকার—এই দুটি শর্ত নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে ছিল।

৬.৩ নিরস্ত্রীকরণ : প্রয়োজনীয়তা

মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের বিখ্যাত চৌদ্দ দফা শর্তের চতুর্থ শর্তটিতে নিরস্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত হয়েছিল। বলা হয়েছিল রাষ্ট্রের সমরসজ্জা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং তা হবে ন্যূনতম অর্থাৎ রাষ্ট্রগুলি তাদের সমরাস্ত্র নিম্নতম পর্যায়ে (Lowest Point) কমিয়ে নিয়ে আসবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে এবং তা পালন করবে।

এছাড়া লীগ চুক্তিপত্রের অষ্টম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল "শান্তি রক্ষার ব্যাপারে সমরাস্ত্রের পরিমাণ জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে নিম্নতম পর্যায়ে কমিয়ে আনার এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পালনে যৌথ কর্মসূচী বলবৎকরণের প্রয়োজনীয়তা লীগের সকল সদস্য স্বীকার করে নিচ্ছে।"

(বি. দ্র. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়)

এই বক্তব্য ভার্সাই সন্ধি চুক্তির পঞ্চম খন্ডে (Part V)-ও জার্মানির নিরস্ত্রীকরণ বা সামরিক শক্তি হ্রাসের নীতি গৃহীত হয়েছিল এবং সন্ধি রচয়িতা সদস্যরাষ্ট্রগুলি বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সমরাস্ত্র হ্রাসের নীতি স্বীকার করলেও, গ্যার্থন হার্ডির মতে মিত্রশক্তিবর্গ কখনোই বলে নি "If you will disarm, we will".

৬.০ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটিতে আলোচিত হয়েছে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা। এককটি পাঠ করে সমকালীন ইউরোপীয় রাজনীতির যে বৈশিষ্ট্যগুলি আপনারা চিহ্নিত করতে পারবেন তা হ'ল :

- যুদ্ধক্ষত পৃথিবীতে শান্তি স্থায়ী করতে যুদ্ধের সম্ভাবনা বিনাশের প্রয়োজনীয়তা ;
- এই প্রয়োজনীয়তার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা ;
- বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে মতভেদ ;
- নিরস্ত্রীকরণের সাফল্য ও ব্যর্থতা।
- লোকার্নো চুক্তি ও উদ্দেশ্য।

৬.১ প্রস্তাবনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ, ধ্বংসলীলা বিশ্বের সমগ্র মানুষকে যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। রাষ্ট্রনায়কগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে একই দেশের হাতে প্রভূত পরিমাণ সমরাস্ত্র পুঞ্জীভূত হলে সেই রাষ্ট্র আগ্রাসী নীতি অনুসরণের পথে ধাবমান হবে এবং শান্তির কথায় কর্ণপাত করবে না। এই জন্য নিরস্ত্রীকরণের দাবী উঠতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কাল শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নটি বিশেষ ভাবে গুরুত্ব লাভ করেছিল। যুদ্ধাবসানে অনেকেই এই মত পোষণ করেছিলেন যে অস্ত্র প্রস্তুতি আন্তর্জাতিক সন্দেহের বাতাবরণ প্রস্তুত করে এবং এই পরিস্থিতিতে বৃদ্ধি পায় অবিশ্বাস ও ভীতি, যার অনিবার্য পরিণত হচ্ছে যুদ্ধ। তাই যুদ্ধ পরবর্তীকালে যে নতুন ব্যবস্থা রচিত হয়েছিল, মুখ্য রাষ্ট্রনায়করা চেয়েছিলেন সেই ব্যবস্থায় যুদ্ধভীতি চিরতরে মুছে যাক। অবশ্য গ্যার্থন হার্ডির মত অনুসরণ করে বলা যায় এই সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জনতার পছন্দসই সরকার। তাই আশা করা হয়েছিল এই নতুন সময়কালে (new era) রাষ্ট্রগুলি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যুদ্ধোপকরণগুলিকে হ্রাস করে ফেলবেন। কাজেই এই সময় নিরস্ত্রীকরণ খুব বড় সমস্যা বা অসুবিধা ছিল না। কিন্তু কিছু রাষ্ট্রনায়ক বুঝেছিলেন বিপদ আসন্ন কারণ শান্তি চুক্তিতে যে ভাবে ভৌমিক বন্দোবস্ত (Territorial Settlement) করা হয়েছে তাতেই নিহিত রয়েছে ভবিষ্যতে বিপদের বীজ। তাই লীগ চুক্তিপত্রে নিরস্ত্রীকরণের নীতি গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ অস্ত্র হ্রাসের ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকেন। এই ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে লীগ অফ নেশনসে একটি মেমোরান্ডাম পেশ করেছিলেন।

৬.২ লয়েড জর্জের মেমোরান্ডাম বা স্মারকলিপি

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ লীগ অফ নেশনসে একটি মেমোরান্ডাম পেশ করলেন ১৯১৯ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে। এতে তিনি নিরস্ত্রীকরণ তথা সমরসজ্জা হ্রাস ও লীগ অফ নেশনসের উদ্দেশ্য ও আদর্শের সাফল্যের শর্তগুলি উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে মুখ্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে (ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি) নৌবহর, অস্ত্র প্রভৃতি সমরসজ্জা প্রসারণের জন্য যে কোন প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রগুলি সহমত পোষণ করবে। সমর উপকরণ হ্রাস না করলে লীগ অর্থহীন হয়ে উঠবে। লীগের পৃষ্ঠপোষক

একক ৬ ❑ নিরস্ত্রীকরণ : সমস্যা ও সমাধানের প্রচেষ্টা

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ লয়েড জর্জের মেমোরান্ডাম বা স্মারকলিপি

৬.৩ নিরস্ত্রীকরণ ও প্রয়োজনীয়তা

৬.৪ নিরস্ত্রীকরণের প্রয়াস

৬.৫ জেনেভা প্রটোকল

- ৬.৫.১ জেনেভা প্রটোকলের উদ্দেশ্য
- ৬.৫.২ জেনেভা প্রটোকলের প্রচেষ্টা
- ৬.৫.৩ জেনেভা প্রটোকলের ব্যর্থতার কারণ
- ৬.৫.৪ জেনেভা প্রটোকলের তাৎপর্য

৬.৬ দূরপ্রাচ্যে ভারসাম্য বিঘ্নকারী রূপে জাপান

- ৬.৬.১ ওয়াশিংটন সম্মেলন (১৯২১-২২)
- ৬.৬.২ ওয়াশিংটন সম্মেলনের সীমাবদ্ধতা
- ৬.৬.৩ সম্মেলনের গুরুত্ব

৬.৭ প্রস্তুতি কমিশন : সমস্যা

- ৬.৭.১ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা, সাফল্য ও মূল্যায়ন

৬.৮ লোকার্নো অধিবেশন (১৯২৫)

- ৬.৮.১ লোকার্নো অধিবেশনের পটভূমি
- ৬.৮.২ লোকার্নো চুক্তির শর্তাবলী
- ৬.৮.৩ লোকার্নো চুক্তির সমস্যা
- ৬.৮.৪ ত্রিস্তরীয় চুক্তি
- ৬.৮.৫ চুক্তির উদ্দেশ্য
- ৬.৮.৬ লোকার্নো চুক্তির অবদান
- ৬.৮.৭ লোকার্নো চুক্তির ত্রুটি
- ৬.৮.৮ লোকার্নো চুক্তির সমালোচনা
- ৬.৮.৯ লোকার্নো চুক্তির তাৎপর্য

৬.৯ সারাংশ

৬.১০ অনুশীলনী

৬.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৩। লীগ কভেন্যান্ট কী?
৪। ১০-১৬ নং ধারায় লীগের কোন নীতি গৃহীত হয়?
৫। লিথুয়ানিয়ার রাজধানীর নাম লিখুন।
৬। 'Wal Wal' অঞ্চল কোথায় অবস্থিত?
৭। জাপান মাঞ্চুরিয়া কত সালে আক্রমণ করে?
৮। লীগের জনকল্যাণমুখী কার্যগুলি কী?
৯। হোর-লাভাল চুক্তি কত সালে সম্পাদিত হয়?
১০। আনুষ্ঠানিকভাবে লীগের বিলুপ্তি কত সালে ঘোষিত হয়?
১১। কোন প্রতিষ্ঠান লীগের স্থান অধিকার করেছে?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। জাতিসঙ্ঘের প্রকৃতি কীরূপ ছিল?
২। লীগ অফ নেশনসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
৩। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে লীগের কর্মপ্রচেষ্টা কীরূপ ছিল?
৪। লীগ কর্তৃক মানবিক ও সামাজিক উন্নয়ন বর্ণনা করুন।

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। আক্রমণকারী রাষ্ট্র রূপে চিহ্নিত জাপান ও ইটালির প্রতি লীগের কার্যকলাপ কী ছিল?
২। লীগের ব্যর্থতার পশ্চাতে সদস্য রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা কী ছিল?
৩। যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কাকে বলে? যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা লীগের দ্বারা কখন রচিত হয়েছিল?
৪। আপনি কি মনে করেন যে লীগ তার সদস্যরাষ্ট্রগুলির স্বার্থ সাধনের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল?—আলোচনা করুন।

৫.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

১। Robert Gilpin—War and Change in World Politics. Pub : Princeton Cambridge University Press.
২। R.P. Dutt—World Politics 1918-1936. Pub : Adhar Prakashan.
৩। W. Lipson— Europe in the Twentieth Century.
৪। প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়—আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস। প্রকাশ—মৌলিক লাইব্রেরী।
৫। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী এবং সিদ্ধার্থ গুহরায়—আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস। প্রকাশক ঃ প্রগেসিভ পাবলিশার্স।
৬। ডঃ অতুলচন্দ্র রায়—আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস। প্রকাশক ঃ মৌলিক লাইব্রেরী।

৫.১০ জাতিসঙ্ঘের কার্যাবলীর মূল্যায়ন

জাতিসঙ্ঘ বিভিন্ন কারণের ফলে সাফল্য লাভ করতে পারেনি সত্য কিন্তু ভবিষ্যত কালের জন্য জাতিসঙ্ঘ যে প্রভাব রেখে যায় তা পরবর্তীকালে বিশ্বের রাজনীতিবিদদের 'জাতিপুঞ্জ' গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। বিশ্বের রাজনীতিজ্ঞরা লীগের পতন হলেও একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনের আশা পরিত্যাগ করেননি। বরঞ্চ দেখা যায় জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার কারণগুলিকে যতটা সম্ভব দূর করে একটি নতুন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ছিল এই প্রয়োজনীয়তার পরিণতি। প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে জাতিসঙ্ঘ এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। লীগ ব্যর্থ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সে সংস্থাগুলির উদ্ভাবন করেছিল যেমন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা, স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত প্রভৃতি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিল। উপরন্তু লীগের জনকল্যাণমুখী কার্যাবলী ছিল যথেষ্ট প্রশংসনীয়। জাতিসঙ্ঘের অবদান সময় ও রাষ্ট্রসীমা অতিক্রম করে মানব সমাজে বর্তমান।

৫.১১ সারাংশ

ভার্সাই সন্ধির প্রথম অধ্যায়ে বলা হয় যে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য জাতিসঙ্ঘ স্থাপিত হবে, যার উদ্দেশ্য হবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপন করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কুড়ি বছরে আন্তর্জাতিক বিরোধ ও সংঘর্ষ রোধ করা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব বৃদ্ধি করার জন্য জাতিসঙ্ঘ যথেষ্ট চেষ্টা করে। এছাড়া মানবিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নেও জাতিসঙ্ঘ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে।

তবে জাতিসঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ রোধ করার ব্যাপারে জাতিসঙ্ঘের সাফল্য ছিল যথেষ্টই সীমিত। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির স্বার্থপর মনোভাব সংযত করতে জাতিসঙ্ঘ ব্যর্থ হয়েছিল। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার চেয়ে নিজ স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রগুলি অতিআগ্রহী ছিল। এদের সংযত করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা জাতিসঙ্ঘকে কখনোই দেওয়া হয়নি। তাই বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির আগ্রাসী মনোভাব প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে লীগ অফ নেশনস নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল এবং ধীরে ধীরে তা বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। লীগের এই বিলুপ্তির পিছনে ছিল তার সভ্য রাষ্ট্রগুলির অসহযোগিতা। লীগ একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যর্থ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু আন্তর্জাতিক যুদ্ধ যে মানবজাতির প্রতি এক অপরাধ এবং অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হিসাবে জাতিসঙেঘর কর্মপ্রয়াস যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে।

৫.১২ অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কত বছরব্যাপী চলেছিল?

২। জাতিসঙ্ঘ কবে স্থাপিত হয়?

হয়নি। কারণ এই গোপন চুক্তির তথ্য প্রকাশিত হয়ে যায় এবং ব্রিটিশ জনমত এই চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে। এই চুক্তি নাকচ হয়ে গেলেও আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা রক্ষিত হয়নি। আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ইতালির অধিকারে আসে। অন্যদিকে সদস্যরাষ্ট্রগুলি লীগের প্রতি অনুগত ছিল না। লীগের দ্বারা যখন ইটালীকে আক্রমণকারী রাষ্ট্ররূপে চিহ্নিত করে অর্থনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হল তখন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলি ইতালিতে তেল তথা পেট্রোলিয়াম সরবরাহ অব্যাহত রাখল। এই পরিস্থিতিতে একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি উৎসাহিত হয়ে ওঠে ও লীগকে অগ্রাহ্য করতে সাহসী হয়। আক্রমণকারী ইতালির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ কার্যকরী করার কোন উপায় লীগের ছিল না কারণ প্রধান দুটি সভ্য রাষ্ট্রই লীগের অনুমোদিত ব্যবস্থা ইতালির বিরুদ্ধে কার্যকর হতে দিতে চায়নি। তাই লীগের দুর্বলতা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

পঞ্চমত, জাতিস্‌ঙ্ঘ ছিল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির এক সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান। এই রাষ্ট্রগুলি তাদের জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি তাই স্বাভাবিকভাবে যৌথ নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। বৃহত্তর আন্তর্জাতিক স্বার্থের খাতিরে লীগের কোন সভ্য রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে প্রস্তুত ছিল না এবং এই জন্য লীগের শর্ত ভঙ্গ করতে তারা দ্বিধা করেনি। সদস্য রাষ্ট্রগুলির আনুগত্যের অভাব লীগের দুর্বলতা প্রকট করেছিল। ত্রিশের দশকে বিশ্বে প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা শান্ত ও যৌথ নিরাপত্তা বিপন্ন করে তোলে। জার্মানি, ইতালি, জাপানে গণতন্ত্র বিরোধী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। তাদের অনুসৃত আগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতি প্রতিরোধের লীগের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়ে। ব্রিটেন, ফ্রান্স লীগের ভিতর কিংবা বাইরে থেকে কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির সম্প্রসারণশীল নীতির ফলে অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া, আবিসিনিয়া, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের স্বাধীনতা বিপন্ন হয় এবং যৌথ নিরাপত্তা বব্যস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। লীগের সভ্য রাষ্ট্রগুলি আগ্রাসী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে কোন ঝুঁকি না নিয়ে যৌথ নিরাপত্তাকে বিপদগ্রস্ত করে ফেলেছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে লীগের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রচেষ্টা হতাশায় রূপান্তরিত হয়।

ষষ্ঠত, জাতিসঙ্ঘকে তার সদস্যরাষ্ট্ররা একটি সুবিধাজনক হাতিয়ারে পরিণত করতে চেয়েছিল। সভ্যরাষ্ট্রগুলি লীগের মাধ্যমে নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফ্রান্সের একমাত্র উদ্দেশ্য জার্মানির পুনরায় আক্রমণকে প্রতিরোধ করা। তাই ফ্রান্স জাতিসঙ্ঘকে জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ মূলক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। জার্মানি লীগের সভ্যপদ লাভ করে ভার্সাই সন্ধির অপমানজনক শর্তগুলিকে নাকচ করাতে চেয়েছিল। ব্রিটেনের উদ্দেশ্য ছিল জাতিসঙ্ঘকে শক্তিসাম্য রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করা। উদ্দেশ্যে ও স্বার্থের এই বিভিন্নতা জাতিসঙ্ঘের স্থায়িত্বের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠেছিল। জাতিসঙ্ঘের লক্ষ্য এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলির জাতীয় স্বার্থের মধ্যে কোন অভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়নি।

সপ্তমত, ভার্সাই চুক্তি অনুসারে যে শান্তি বিশ্বে স্থাপিত হয় তাকে চিরস্থায়ী করার দায়িত্ব ছিল জাতিসঙ্ঘের। প্রকৃতপক্ষে এই শান্তি ছিল একটি রাজনৈতিক শান্তি। ১৯৩০ সালের পর থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সংকট কালের সূচনা হয়। সংকটকালীন অস্থির, অনিশ্চিত রাজনীতির আঘাতে জাতিসঙ্ঘ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পূর্বের মর্যাদাও হারিয়ে ফেলে। ১৯১৯ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত লীগ তার অস্তিত্ব বর্তমান রেখেছিল। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে জাতিসঙ্ঘের অস্তিত্ব আইনসিদ্ধভাবে বিলুপ্ত হয়।

লীগ অফ নেশনসের বিরোধী ছিল। বলা হয়ে থাকে ভার্সাই সন্ধি ছিল এক বৈষম্যপূর্ণ দলিল (ill-balanced document) যাতে ছিল ঘৃণা, প্রতিশোধস্পৃহা এবং উইলসনের আদর্শবাদ, লয়েড জর্জের সাম্রাজ্যবাদ ও ক্লিমেনশ বা ক্লেমেসোঁর বাস্তববুদ্ধি (materialism)। এই সব মিশ্র অনুভূতি সম্বলিত ভার্সাই চুক্তি প্রথম থেকেই জটিল ছিল। এই পরিস্থিতিতে ভার্সাই সন্ধি চুক্তিতে লীগ চুক্তিপত্রের অন্তর্ভুক্তি জাতিসঙ্ঘকে দুর্ভাগ্য পীড়িত করেছিল প্রথম থেকেই।

দ্বিতীয়ত, জাতিসঙ্ঘে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব স্বীকত হয়নি। উপরন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে আমেরিকা প্রথম থেকে জাতিসঙ্ঘের সদস্য পদ গ্রহণ না করায় লীগ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে জার্মানি, ইটালি, রাশিয়া, জাপান লীগের সভ্যপদ ত্যাগ করেছিল। বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ ব্যতিরেকে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সাফল্য লাভ করতে পারে না। লীগ চুক্তিপত্রের ১০ থেকে ১৬ নং ধারায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে যে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল লীগ বহির্ভূত রাষ্ট্রগুলির উপর লীগের এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের কোন এক্তিয়ার ছিল না।

তৃতীয়ত, লীগ চুক্তিপত্রের কোথাও আগ্রাসন বা যুদ্ধকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়নি। চুক্তিপত্র অনুসারে যুদ্ধে লিপ্ত হতে সভ্যরাষ্ট্রদের নিষেধ করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার ও রাজনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব লীগের উপর থাকলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভ্যদের একমত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তাই কোন রাষ্ট্র তার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কায় একমত না হতে পারলে লীগের পক্ষে কোন কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হত না। জাতিসঙ্ঘ আক্রমণ প্রতিরোধে প্রস্তাব গ্রহণ করলেও প্রস্তাব কার্য্যকর করার জন্য কোন সামরিক বাহিনী লীগের ছিল না। তাই কোন আগ্রাসী বা আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিসঙ্ঘ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত না। সামরিক অক্ষমতার কারণে আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলি লীগকে উপেক্ষা করতে থাকে। যেমন জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখল ও ইটালির আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া দখল প্রভৃতি কাজের বিরুদ্ধে লীগ জাপান ও ইটালি কারোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। এটা লীগের পক্ষপাতিত্ব ও দুর্বলতার প্রমাণ ছিল। তাই জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ইটালিও লীগ ত্যাগ করতে সাহসী হয়েছিল।

চতুর্থত, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ছিল জাতিসঙ্ঘের প্রধান স্তম্ভ। এই সদস্যরাষ্ট্র দুটি লীগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে যথোচিত মর্যাদা দানের পরিবর্তে নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যস্ত ছিল। স্থায়ী সভ্য রাষ্ট্রগুলি লীগের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হবার কারণে লীগের ভিত্তি দুর্বল হতে থাকে। ১৯৩১ সালে জাপান মঞ্চুরিয়া দখল করলে লীগের ১১নং ধারা অনুসারে জাপানকে প্রতিহত করতে লীগ ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড লিটনের তত্ত্বাবধানে যে কমিশন গঠিত হয় সেই প্রতিবেদনে জাপানকে আক্রমণকারী বলে চিহ্নিত করা হয়নি এবং ১৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাপানের বিরুদ্ধে লীগ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেনি। অন্য দিকে ইতালি আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া আক্রমণ করে ১৯৩৫ সালে এবং লীগের ১৬নং ধারা অনুযায়ী ইতালির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ইতালিকে আক্রমণকারী রাষ্ট্ররূপে চিহ্নিত করে ইতালির সঙ্গে সর্বপ্রকার আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হ'ল অর্থাৎ ইতালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (economic sanctions) গৃহীত হয়।

কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই নির্দেশ পালনে আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিল না। রাষ্ট্র দুটি লীগের নির্দেশ পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করতে থাকে। কারণ একদিকে রাষ্ট্র দুটি ইতালির বিরাগ ভাজন হতে চায়নি একই সঙ্গে জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাবের বিরোধিতাও করেনি। ইটালীর সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখার জন্য ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স জাতিসঙ্ঘকে ইতালির সঙ্গে মীমাংসার পরামর্শ দিয়েছিল। এমনকি ইংল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার স্যামুয়েল হোর ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিয়ের লাভাল ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এক গোপন চুক্তিতে ইতালির সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হন। চুক্তি অনুযায়ী আবিসিনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড ইতালিকে দেবার অঙ্গীকার করা হয়। তবে আবিসিনিয়ার স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। হোর-লাভাল চুক্তি অবশ্য বাস্তবায়িত

৫.৭.৩ সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন

জাতিসংঙ্ঘ নারী, শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পুনর্বাসন, সংক্রামক ব্যধি নিবারণ প্রভৃতি কাজে খুব তৎপর থাকতো। ১৯২৩ সালে স্থায়ী সংস্থা ও ম্যালেরিয়া কমিশন গঠিত হয়। এই সংস্থাগুলি পূর্ব গোলার্ধে কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি রোগের প্রতিরোধে সফল হয়েছিল। এছাড়া দাস ব্যবসা ও বিপদজনক মাদক দ্রব্য ব্যবসা বন্ধ করার ব্যাপারে জাতিসঙ্ঘ সফল হয়।

৫.৮ জাতিসঙ্ঘের কৃতিত্ব

১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে জাতিসঙ্ঘের কর্মপ্রয়াস সর্বাধিক সাফল্য লাভ করেছিল। লীগের মর্যাদাও এই সময়ে বৃদ্ধি পায়। লীগ সাফল্যের সঙ্গে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছিল। এই সাফল্যের সময়কালকে E. H> Carr (১৯২৫ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত) লীগের ইতিহাসে গৌরবজনক অধ্যায় বলে বর্ণনা করেছেন ("League at its Zenith")। কিছু ক্ষেত্রে লীগ অসফল হলেও লীগের কর্মপ্রচেষ্টাকে অবহেলা করা যায় না। জাতিসঙ্ঘ মানবিক ও সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, বিশ্বস্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার, পরিবহনের উন্নতি ইত্যাদি কর্মকান্ডের দ্বারা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত হয়েছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। বিশ্বপ্রতিষ্ঠান হিসাবে জনগণের সামনে সৌহার্দ্য, সমবায়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল লীগ অফ নেশনস। বাস্তবিক পক্ষে সমবায়ের আদর্শপ্রাচীন হলেও লীগের উদ্দেশ্য, কর্মপ্রচেষ্টা ছিল অভিনব এবং এর পদ্ধতি ছিল নতুন। লীগ কয়েকটি লক্ষ্য ও শর্তকে সম্মুখে রেখে জয়যাত্রা শুরু করেছিল এবং যেভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বিবাদ মীমাংসার প্রয়াস চালিয়েছিল তা ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি। শেষ পর্যন্ত লীগের ব্যর্থতারদায়িত্ব ছিল প্রধানত তার সদস্য রাষ্ট্রগুলির। "The League failed in the end to preserve peace because it could be only what the nations made of it—nothing less and nothing more"—Langsam.

৫.৯ জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার কারণ

পৃথিবীতে গণতন্ত্রকে নিরাপদ করা, মানব সভ্যতাকে যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করা, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি মহান আদর্শকে সামনে রেখে লীগ তার জয়যাত্রা শুরু করেছিল। বস্তুতপক্ষে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্য রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসঙ্ঘ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ লীগ স্থাপনের কুড়ি বছরের মধ্যেই লীগ অফ নেশনস নামক বিশ্ব প্রতিষ্ঠানটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯১৯-১৯৩৯ এই কুড়ি বছরের ব্যবধানেই বিশ্ববাসী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। লীগ অফ নেশনসের ব্যর্থতার জন্য অনেকগুলি কারণকে চিহ্নিত করা যায়।

প্রথমত, লীগ অফ নেশনস বা জাতিসঙ্ঘের গঠন তন্ত্রের মধ্যে এর পতনের কারণ লুকিয়ে ছিল। ভার্সাই সন্ধি চুক্তির শর্ত হিসাবে লীগ চুক্তিপত্রের অন্তর্ভূক্তি ছিল দুর্ভাগ্যজনক। জার্মানি, রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র ভার্সাই সন্ধির চুক্তির বিরোধী। জার্মানি প্রথম থেকে এই সন্ধি পরিবর্তনের পক্ষে ছিল। কারণ জার্মানির ধারণা হয়েছিল বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই ভার্সাই সন্ধি রচিত হয়েছে এবং জাতিসঙ্ঘ গঠিত হয়েছে। তাই জার্মানি

পরিষদ কর্তৃক এই অভিযোগ সমর্থিত হলে জাতিসঙ্ঘের চুক্তিপত্রের ১৬নং ধারা অনুযায়ী ইটালির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অর্থনৈতিক অবরোধ মঞ্জুর হয় তবে কোনো সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে জাতিসঙ্ঘ বিরত থাকে।

৫.৭ লীগ অফ নেশনসের অন্যান্য কার্যাবলী

একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতিসঙ্ঘের বা লীগ অফ নেশনসের দায়িত্ব ছিল অনেক বেশি প্রসারিত। বিশ্ব শান্তিরক্ষা ও বিবাদের মীমাংসা করা ব্যতীত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করে পৃথিবীতে নিরাপত্তার মানসিকতা সৃষ্টি করাও ছিল লীগের দায়িত্ব। জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে যৌথ নিরাপত্তার (Collective Security) প্রচেষ্টা খুবই উল্লেখযোগ্য।

৫.৭.১ জাতিসঙ্ঘ ও বিশ্বশান্তি

প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ বর্জন করার মহান উদ্দেশ্য নিয়েই জাতিসংঘ নামক বিশ্বপ্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লীগ চুক্তিপত্র (Covenant) কয়েকটি শর্ত সন্নিবিষ্ট করে। লীগ চুক্তিপত্রের অষ্টম শর্তটি ছিল প্রতিটি রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যে পরিমাণ অস্ত্রেবপ্রয়োজন তার অতিরিক্ত অস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করবে। কারণ অস্ত্রের প্রাচুর্যে বিশ্বে যুদ্ধের আবহাওয়া ঘনীভূত হয় যা নিরাপত্তা ও বিশ্বশান্তির পরিপন্থী। তাই অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করার দায়িত্ব ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দায়িত্ব ছিল লীগ কাউন্সিলের। দশম শর্তটি ছিল এই যে সদস্য রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। চতুর্দশ শর্তটি ছিল আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপনের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি। এজন্য একটি স্থায়ী আদালত Permanent Court of International Justice (P.C.I.J.) কাজ করত। আন্তর্জাতিক আইনগত বিরোধ ও অন্যান্য বিরোধ এই আদালতে নিষ্পত্তি হতো।

৫.৭.২ অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

পৃথিবীর যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য জাতিসঙ্ঘ একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল আর্থিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতার জন্য নতুন পরিকাঠামো প্রস্তুত করা হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত আর্থিক কমিটিগুলি জেনেভায় বার্ষিক সম্মেলনে মিলিত হতো ও জাতিসঙ্ঘের আর্থিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করতো। ১৯২০ সালে ব্রাসেলসে একটি অর্থনৈতিক সম্মেলন আহূত হয়। জাতিসঙ্ঘের এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল মুদ্রাস্ফীতি রোধ, স্বর্ণমান নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাধা দূরীকরণ, আন্তর্জাতিক পরিবহন উন্নয়ন প্রভৃতি। এছাড়া ১৯২৭ সালে জেনেভায় আহুত অর্থনৈতিক সম্মেলনে জাতিসঙ্ঘ কয়েকটি সুপারিশ পেশ করে যেমন সব দেশের মধ্যে শ্রমিক, পণ্যও মূলধন প্রভৃতির চলাচল উন্মুক্ত রাখা, বাণিজ্য শুল্কের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা, শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে কৃষি উন্নয়ন। বিশ্বের অর্থনৈতিক সঙ্কট, যুদ্ধকালীন ঋণ ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি আলোচনার জন্য ১৯৩২ সালের জুন মাসে জাতিসঙ্ঘের সম্মেলন আহুত হয় যা লসান বৈঠক (Lausanne Conference) নামে পরিচিত। এই বৈঠকে যোগ দিলেন ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালি, জাপান ও জার্মানির প্রতিনিধিগণ। এই সম্মেলনে এককালীন একটি কিস্তিতে মোট ১৫ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ প্রদান করার সুযোগ পেয়েছিল জার্মানি। যুদ্ধক্ষত পৃথিবীর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে লীগ যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিল।

৫.৬.১০ গ্রীস-বুলগেরিয়া সংঘর্ষ

গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ১৯২৫ সালে এই সংঘর্ষে গ্রীসের একজন সীমান্ত সেনাপতি ও রক্ষীর মৃত্যু হলে গ্রীস সসৈন্যে বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করে। জাতি সংঘের হস্তক্ষেপের পর গ্রীস সৈন্য প্রত্যাবর্তন করে নেয় ও বুলগেরিয়াকে ক্ষতিপূরণ দান করে।

৫.৬.১১ কলম্বিয়া-পেরু বিবাদ

এছাড়া দক্ষিণ আমেরিকায় কলম্বিয়া ও পেরুর মধ্যে বিবাদ, ইংল্যান্ড ও তুরস্কের মাবুলের তৈলখনি সম্পর্কিত বিবাদ প্রভৃতি জাতিসঙ্ঘের প্রয়াসে শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসিত হয়।

৫.৬.১২ ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ

ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে টিউনিসিয়ার অধিবাসী নিয়ে বিবাদ দেখা দেয় ১৯২১ সালে উভয় রাষ্ট্রই এই অধিবাসীদের নিজ নাগরিক বলে গণ্য করত। ফ্রান্স এদের ফরাসী নাগরিক দাবী করে সেনা বাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করে এবং ব্রিটেন এর তীব্র প্রতিবাদ করলে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু তার পূর্বেই বিবাদের নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

৫.৬.১৩ মাঞ্চুরিয়া সমস্যা

তবে জাতিসঙ্ঘ সর্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। বিশেষত শক্তিশালী সদস্যরাষ্ট্রগুলির দ্বারা উদ্ভূত রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে লীগ তার নিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখতে পারেনি। চীন, জাপান, ইটালি প্রমুখ ছিল লীগের সভ্য রাষ্ট্র। ১৯৩১ সালে জাপান চীনের মঞ্চুরিয়া অঞ্চলটি দখল করে নেয় এবং এখানে মঞ্চুকুয়ো নামে তাঁবেদার সরকারও গঠন করে। জাপানের এই কার্যের বিরুদ্ধে চীন জাতিসঙ্ঘে অভিযোগ নিয়ে আসে এবং জাতিসঙ্ঘ জাপানকে মাঞ্চুরিয়া থেকে সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু জাপান লীগের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে মাঞ্চুকুয়োর আয়তন বৃদ্ধি করার জন্য চীনের যে জেহোল অঞ্চল দখল করে তা মঞ্চুকুয়োর সঙ্গে সংযুক্ত করে, এমনকি চীনা প্রাচীরের দক্ষিণ ভাগেও সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে থাকে। জাতিসঙ্ঘের চুক্তিপত্রে ১১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাপানকে প্রতিহত করতে লীগ অপারগ হয়। লর্ড লিটনের (Lord Lytton) সভাপতিত্বে লীগের পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের (ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানি) নিয়ে একটি কমিশন গঠিত হল। ১৯৩২ সালে লিটন কমিশন এক দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৯৩৩ সালে লীগের সাধারণ সভায় লিটন কমিশনের প্রতিবেদন গৃহীত হলেও লীগ চুক্তির ১৬নং ধারা অনুযায়ী জাপানের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লীগ গ্রহণ করতে পারেনি এবং জাপান ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে লীগের সদস্য পদ ত্যাগ করে।

৫.৬.১৪ ইটালির ইথিওপিয়া অভিযান

ইটালি কর্তৃক ইথিওপিয়া আক্রান্ত হলে লীগ তার সভ্যরাষ্ট্র ইটালির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও সফল হতে পারেনি। ইটালির ইথিওপিয়া রাজ্য-দখল লীগের দুর্বলতা প্রমাণ করেছিল। ইটালির অধীনস্থ সামালিল্যান্ড ও ইথিওপিয়ার সীমান্তবর্তী ওয়ালওয়ান (Walwal) নামক স্থানে ইথিওপিয়ার সৈন্যদের সঙ্গে সোমালিল্যান্ডের সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হয় এবং যুদ্ধে কিছু ইটালি সৈন্য হতাহত হয়। এই ঘটনায় ইটালি ইথিওপিয়া আক্রমণ করে ১৯৩৬ সালে এবং আক্রান্ত ইথিওপিয়া লীগের কাছে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। লীগ

৫.৬.৪ পোল্যান্ড লিথুয়ানিয়া বিরোধ

লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনা ১৯২০ সালে পোল্যান্ড কর্তৃক অধিকৃত হয়। লীগ কাউন্সিল আলাপ আলোচনা করে মীমাংসা করতে অসফল হলে ১৯২২ সালে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং ভোটের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভিলনাকে পোল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। একই সঙ্গে লীগ পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়ার সীমান্ত অঞ্চল নির্ধারিত করে দেয়।

৫.৬.৫ কর্ফু বিরোধ

পরের বছর ইটালি ও গ্রীসের মধ্যে কর্ফু দ্বীপ নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়। ইটালি সামরিক বলপ্রয়োগ করে দ্বীপটি বিধ্বস্ত করে এবং গ্রীস এই বিষয়টিকে লীগ কাউন্সিলের কাছে উপস্থিত করে। ইটালি কর্ফু ঘটনাকে ইটালির বিষয় বলে গণ্য করে লীগের হস্তক্ষেপ অস্বীকার করে, পরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতগণ প্যারিসে মিলিত হন ও কর্ফু বিরোধের মীমাংসা করেন। পরে ইটালি কর্ফু পরিত্যাগ করে ও গ্রীস ক্ষতিপূরণ প্রদান করলে এই বিবাদের মীমাংসা হয়।

৫.৬.৬ সাইলেশিয়ার সমস্যা

জার্মানি ও পোল্যান্ডের মধ্যে উচ্চ সাইলেশিয় (Upper Silesia) প্রশ্নে বিবাদের সূচনা হয়। ভার্সাই সন্ধিতে উচ্চ সাইলেশিয়ার কিছু অংশ চেকোশ্লোভাকিয়া লাভ করেছিল। বাকি অংশ ১৯২১ সালে গণভোটের মাধ্যমে জার্মানির সঙ্গে সংযুক্তি দাবী করলে জার্মানি এই দাবীর বিরোধিতা করে। লীগেরকাউন্সিল এই সংঘাতময় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য চীন, স্পেন, বেলজিয়াম ও ব্রাজিল প্রভৃতি রাষ্ট্রর প্রতিনিধিদের এক কমিশন গঠন করে। এই কমিশন সাইলেশিয়ার অবশিষ্ট অবিভক্ত অঞ্চল পোল্যান্ড ও জার্মানির মধ্যে বণ্টন করে শান্তি স্থাপন করে।

৫.৬.৭ তুরস্ক-ইরাক বিবাদ

১৯২৪ সালে তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে সীমান্তবর্তী অঞ্চল নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। বিশ্বযুদ্ধের অবসানে তুরস্ক ও ইরাকের তদারকি অঞ্চলের সীমান্ত নির্দিষ্ট করার দায়িত্ব ছিল লীগ পরিষদের। এজন্য নিযুক্ত হয় একটি নিরপেক্ষ সীমান্ত কমিশন, এই কমিশনের কর্মপ্রয়াস চলাকালীন তুরস্ক-ইরাক সীমান্ত প্রদেশে গোলোযোগের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে তুরস্কের অধিকারভুক্ত কুর্দ জাতি তুর্কী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তুরস্ক সরকার নৃশংসভাবে বিদ্রোহ দমন করে। ক্ষুব্ধ কুর্দ জাতি তুরস্ক-ইরাক সীমান্তে গোলমাল সৃষ্টি করলে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করে লীগের দ্বিতীয় কমিশন যে প্রতিবেদন পেশ করে তাতে তুর্কী প্রশাসনিক ব্যবস্থা সমালোচিত হয়। শেষ পর্যন্ত লীগ কমিশনের সিদ্ধান্ত তুরস্ক ও ইরাক উভয়েই মেনে নেয় ও ১৯২৬ সালে একটি সন্ধি দ্বারা দুটি রাষ্ট্র তুরস্ক-ইরাক সীমান্ত অনুমোদিত হয়।

৫.৬.৮ আর্মেনিয়া-তুরস্ক বিবাদ

১৯২০ সালে প্রজাতন্ত্রী আর্মেনিয়া ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল এবং লীগের নেতৃত্বে তা মীমাংসার চেষ্টা হয়। তবে লীগের সিদ্ধান্তের পূর্বেই তুরস্ক আর্মেনিয়া দখল করে নেয়।

৫.৬.৯ যুগোশ্লাভিয়ার আক্রমণ

লীগ ১৯২১ সালে যুগোশ্লাভিয়ার আক্রমণ থেকে আলবানিয়াকে সুরক্ষিত করেছিল।

দ্বারা আন্তর্জাতিক শ্রমিক নীতি নির্ধারণ করত। জাতিসঙ্ঘের সকল সংস্থার মধ্যে এই শ্রমিক সংস্থার সাফল্য ও সার্থকতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সংস্থা আজও বর্তমান যা শ্রমিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য জীবনযাত্রার এক নূন্যতম মান নির্ধারণ করে দেয়।

স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত—পনেরো জন বিচারক নিয়ে স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত হয়েছিল। এই বিচারকদের কার্যকাল ছিল নয় বছর। সর্ব প্রকার আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা, বিভিন্ন চুক্তির ব্যাখ্য জনিত বিরোধ নিষ্পত্তি করা, আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গজনিত অপরাধের বিচার এই আদালতের উপর ন্যস্ত ছিল।

৫.৫.৫ জাতিসঙ্ঘের প্রকৃতি

লীগ অফ নেশনস ছিল কয়েকটি রাষ্ট্রের সংঘ। এটির গঠন যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির ছিল না। লীগ কোন আইন রচনার ক্ষমতার অধিকারী ছিল না, লীগের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করার বিষয়টি সদস্যদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করতো। বাস্তবিক পক্ষে লীগের অস্তিত্বও নির্ভর করতো সদস্যরাষ্ট্রগুলির সহযোগিতার উপর। সদস্যরাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে স্বীকৃত হয়ে জাতিসংঘ গড়ে তুলেছিল, তাই লীগ কোন রাষ্ট্র ছিল না ; লীগের কোন সমর বাহিনী ছিল না। লীগ ছিল যেন ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের একটি পারিবারিক সংস্থা। আবার এই সংস্থাটির ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ন্ত্রণের কোন অধিকার ছিল না।

৫.৬ লীগের কার্যকলাপ

১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সময়কালে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজে লীগ প্রশংসনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। লীগের কার্যাবলীর মধ্যে রাজনৈতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, সমরাস্ত্র হ্রাস, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, শিল্প, কৃষি এবং বিশ্বস্বাস্থ্য উন্নয়ন, ব্যাধি নিবারণ প্রভৃতি কর্তব্য সম্পাদন অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

৫.৬.১ লীগের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা

লীগ অফ নেশনস তার স্থায়িত্বকালের মধ্যে অনেকগুলি রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করেছিল। প্রায় চল্লিশটি ছোট বড় রাজনৈতিক বিবাদ লীগের সামনে উপস্থাপিত হলে লীগ তার সুষ্ঠ মীমাংসা করেছিল। তবে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক বিবাদ নিরসনের ক্ষেত্রে লীগ সর্ব ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। আন্তর্জাতিক সমস্যার মধ্যে যে সব ক্ষেত্রে লীগের প্রয়াস সফল হলো সেগুলি হ'ল :

৫.৬.২ ইউপেন ও মামেডি

ইউপেন (Eupen) ও মামেডি (Malmedy) নামক প্রদেশ দুটি ছিল প্রাশিয়া ও বেলজিয়ামের সীমান্তবর্তী। ভার্সাই সন্ধিতে বেলজিয়াম এই দুটি প্রদেশ লাভ করেছিল। ১৯২০ সালে লীগের নেতৃত্বে গণভোটের মাধ্যমে প্রদেশদুটির হস্তান্তরকরণ আইনত স্বীকৃতি লাভ করে।

৫.৬.৩ অল্যান্ড দ্বীপ সমস্যা

একই বছর সুইডিশ জাতি অধ্যুষিত অল্যান্ড (Aaland Islands) দ্বীপপুঞ্জের উপর অধিকার নিয়ে ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই দুটি রাষ্ট্র লীগের সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের মধ্যস্থতায় লীগ কাউন্সিলের শরণাপন্ন হলে লীগ এই দ্বীপপুঞ্জের অধিকার ফিনল্যান্ডকে দান করে এবং দ্বীপবাসী সুইডিশ জনতার দায় লীগ গ্রহণ করে। এছাড়া অল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ নিরপেক্ষ অঞ্চল রূপে ঘোষিত হয়।

৫.৫.৩ জাতিসঙ্ঘের সভ্যপদ

পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি জাতিসঙ্ঘের সভ্য ছিল। স্থায়ী সভ্য ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইটালী ও জাপান। ১৯১৯ সালের ২৮ শে এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হল এবং তার প্রথম অধিবেশন হলো ১৯২০ সালের ১০ই জানুয়ারি। রাষ্ট্রপতি উইলসন লীগের অন্যতম স্থপতি হলেও আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে জাতিসঙ্ঘের সভ্য পদ থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরে আসে। ১৯২০ সালে সাধারণ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি উইলসন ও তাঁর ডেমোক্রেটিক পার্টি পরাজিত হয় এবং বিজয়ী রিপাবলিকান পার্টি পরিচালিত মার্কিন সরকার জাতিসঙ্ঘে যোগ দিতে স্বীকৃত হয়নি। আমেরিকার সিনেট (Senate) ভার্সাই সন্ধি অনুমোদন করে পুনরায় ইউরোপীয় গোলযোগে আমেরিকাকে জড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছুক ছিল না। তাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে লীগ সূচনাকাল থেকেই দূর্বল হয়ে পড়েছিল। ১৯২৬ সালে জার্মানিকে লীগের সদস্যপদ দেওয়া হয় এবং ১৯৩৪ সালে রাশিয়া জাতিসঙ্ঘে যোগ দেয় তবে অল্প সময়ের মধ্যেই জাপান, জার্মানি, ইটালি, রাশিয়া লীগ পরিত্যাগ করে। ১৯৪০ সালে বৃহৎ শক্তির মধ্যে কেবলমাত্র ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স জাতিসঙ্ঘে সভ্য হিসাবে রয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পুনরায় পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং লীগের পতন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ১৯৪৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়।

৫.৫.৪ লীগের গঠন

একটি সাধারণ সভা, লীগ কাউন্সিল ও লীগ সচিবালয় এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রভৃতি সংস্থাকে জাতিসঙ্ঘের কার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সাধারণ সভা—জাতিসঙ্ঘের সকল সদস্যই এর সভ্য হলেও প্রতি সদস্য-রাষ্ট্রের তিনজন করে প্রতিনিধি নিয়ে এই সভা গঠিত হলো। তবে প্রতি রাষ্ট্রেরই মাত্র একটি করে ভোট দানের অধিকার ছিল। লীগের এক্তিয়ারভুক্ত যাবতীয় বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সাধারণ সভার ছিল। আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা, সংখ্যালঘু সমস্যা, ম্যান্ডেট অঞ্চলের শাসন, লীগের বার্ষিক বাজেট প্রভৃতি কার্য সাধারণ সভা সম্পাদন করতো।

লীগ কাউন্সিল—জাতিসঙ্ঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রধান দায়িত্ব ছিল লীগ পরিষদের উপর। লীগ চুক্তিপত্র অনুযায়ী পাঁচ জন স্থায়ী ও চার জন অস্থায়ী সভ্য নিয়ে লীগ পরিষদ বা লীগ কাউন্সিল গঠিত হবে বলে স্থির ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগে যোগ না দেওয়ায় স্থায়ী সভ্য সংখ্যা কমে যায়। লীগ চুক্তিপত্র অনুযায়ী পরিষদ আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা, বিবাদমান রাষ্ট্রের মধ্যে মীমাংসা করা, সাধারণ সভার কাছে রিপোর্ট প্রদান করা, বিদেশী আক্রমণের হাত থেকে কোন সদস্য-রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, চুক্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি লীগ পরিষদের কার্যভুক্ত ছিল।

লীগ সচিবালয়—জেনেভা শহরে জাতিসঙ্ঘের মহাসচিবের যে দপ্তরটি কার্য পরিচালনা করতো তাকে লীগ সচিবালয় বলা হতো। এই দপ্তর সাধারণ সভা ও লীগ পরিষদের নির্দেশগুলি কার্যকর করতো।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা—শ্রমিকদের উন্নতির জন্য ন্যায়, নীতি ও সুবিচারের ভিত্তিতে সকল দেশের শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করা ছিল এই সংস্থার উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার তিনটি প্রধান অঙ্গ ছিল। সাধারণ সভা (General Conference), কর্মপরিষদ (Governing Body), আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর (International Labour Office)। শ্রম সংস্থার মালিকপক্ষের প্রতিনিধি, শ্রমিকগণের প্রতিনিধি এবং সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা থাকতেন। প্রতি বছর এই সংস্থার একবার অধিবেশন বসত এবং সদস্যরা নির্বাচনের

তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্রগুলি প্রদত্ত বার্ষিক রিপোর্ট গ্রহণ ও তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য এবং শাসনাধীন অঞ্চলগুলিতে জাতিসঙ্ঘের আদেশ পালিত হচ্ছে কিনা সে সব সম্পর্কে কাউন্সিলকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি স্থায়ী কমিশন গঠন করা হবে।

জাতিসঙ্ঘের চুক্তিপত্রে বিশদ ভাবে বর্ণিত হয়েছিল এর আদর্শ ও উদ্দেশ্যগুলি। বিশ্বের জনমানসে নিরাপত্তার মনোভাব জাগ্রত করা, আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, আন্তর্জাতিক আইনকে মান্যতা প্রদান করা, বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্মান বৃদ্ধি করা প্রভৃতি লীগের আদর্শ রূপে গৃহীত হয়।

জাতিসঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধকে পরিহার করে যে কোন আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপোষ ও মীমাংসা দ্বারা নিষ্পত্তি করা। এছাড়া লীগ চুক্তিপত্রের প্রস্তাবনায় বলা হয় জাতিসঙ্ঘে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধে লিপ্ত হবে না ; কোন সভ্য রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হলে, আক্রান্ত সভ্য রাষ্ট্রকে লীগ অফ নেশনস্ যৌথ নিরাপত্তা (Collective Security) দানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে ; সভ্য রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক সম্মানজনক সম্বন্ধ বজায় রাখবে ; এছাড়া আর্ন্তজাতিক নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করা ও বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫.৫.১ যৌথ নিরাপত্তা

লীগ চুক্তিপত্রের ১০-১৬নং ধারায় যৌথ নিরাপত্তার নীতি গৃহীত হয়েছে। ১০নং ধারায় বলা হয়েছিল জাতিসঙ্ঘের সভ্যগণ পারস্পরিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতাকে সম্মান করবে ও বহিঃআক্রমণ থেকে রক্ষা করবে।

লীগ চুক্তিপত্রের ১৬নং ধারায় বলা হয়েছিল আক্রমণকারী রাষ্ট্রকে শাস্তি প্রদানের জন্য আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে লীগ সভ্যগণ যৌথভাবে অর্থনৈতিক অবরোধ ও প্রয়োজনে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এইভাবে জাতিসঙ্ঘ পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল। তাই জাতিসঙ্ঘের সদস্যরা এক সুনির্দিষ্ট পন্থা তথা যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রয়াসী হলেন। প্রকৃতপক্ষে যৌথ নিরাপত্তার অর্থ হলো শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রগুলি সহযোগিতামূলক বলপ্রয়োগ দ্বারা পৃথিবীর শান্তি রক্ষার্থে শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে শান্তি রক্ষা করতে বাধ্য করবে। ("Peace in the world can be maintained through the co-operative coercion of the peacebreaking states by peace loving states". Prof. Schuman).

৫.৫.২ জাতিসঙ্ঘের কর্মপ্রয়াস

জাতিসঙ্ঘ শুধুমাত্র যুদ্ধ নিরসন ও যুদ্ধ সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে যে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তা নয়, বিভিন্ন রাষ্ট্রর মধ্যে সহযোগিতা ও মিত্রতার ভাব সৃষ্টিও করেছিল। জাতিসঙ্ঘ সাধারণ সভা, জাতিসঙ্ঘ পরিষদ (council), লীগ সচিবালয় প্রভৃতি দপ্তর গঠন করে সখ্যতার পরিমণ্ডল রচনা করেছিল। গুপ্ত সন্ধি সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। তাই লীগ চুক্তিপত্রে বলা হয়েছিল সন্ধিপত্র লীগ সচিবালয়ে পেশ করা বাধ্যতামূলক হবে। এছাড়া অস্ত্রের ব্যাপক হারে উৎপাদন বৃদ্ধি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই জাতিসঙ্ঘ অস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস তথা সীমাবদ্ধ করতে সক্রিয় হয়। রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়াও কিছু জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী যেমন আফিম প্রভৃতি মাদকের ব্যবসা নিযন্ত্রণ, দাস ব্যবসা রহিত করা, শ্রমিক সঙ্ঘ স্থাপন প্রভৃতি জাতিসঙ্ঘের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২২নং অনুচ্ছেদ

বিগত যুদ্ধের ফলে যে সমস্ত উপনিবেশ এবং ভূখণ্ডগুলি পূর্বে যে সব রাষ্ট্রর শাসনাধীনে ছিল, তাদের সার্বভৌম ক্ষমতার অধীনে যদি আর না থাকে এবং যে সকল উপনিবেশ ও ভূখণ্ডগুলির জনসাধারণ বর্তমান বিশ্বের কঠিন অবস্থার চাপে এখনও পর্যন্ত নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি ; এই ধরনের দেশগুলির জনসাধারণের ক্ষেত্রে সুখ এবং সমৃদ্ধির বিকাশ সভ্য সমাজের একটি পবিত্রকর্তব্য এবং এই কর্তব্য কার্যকরী করা সুরক্ষিত করতে চুক্তিপত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

এই নীতি বাস্তবসম্মতভাবে কার্যকর করে তুলতে যে পদ্ধতি সর্বোত্তম, তাহ'লে এই সব দেশের জনগণের অভিভাবকত্ব সেই সমস্ত অগ্রসর জাতিগুলির হাতে ন্যস্ত করা ; যারা সম্পদশালী হওয়ার কারণে এবং অভিজ্ঞতা অথবা ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এই দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা ভালভাবে পালন করতে পারবে। যে সমস্ত অগ্রসর রাষ্ট্র এই দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক তাদেরই এই অধিকার দেওয়া উচিত এবং এই রাষ্ট্রগুলিকে লীগের তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসাবেই অভিভাবকত্বের কাজ চালাতে হবে।

জনগণের বিকাশের স্তর, আঞ্চলিক ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অনুরূপ অন্যান্য অবস্থা অনুসারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চরিত্র আলাদা হবে।

কিছু কিছু জনগোষ্ঠী যারা আগে তুরষ্ক সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল, তারা এখন এমন এক বিকাশের স্তরে এসে পৌঁছেছে যে, তাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশাসনিক উপদেশ এবং সাহায্যের প্রতি দায়বদ্ধ রেখে সাময়িকভাবে তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। যতদিন পর্যন্ত এই জনগোষ্ঠীগুলি নিজেরা স্বশাসনের উপযোগী না হবে ততদিন এই দায়বদ্ধতা থাকবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই জনগোষ্ঠীগুলির ইচ্ছাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে।

অন্যান্য জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে মধ্য আফ্রিকার জনগোষ্ঠীগুলি এমন একটা পর্যায়ে রয়েছে যে, সেখানকার প্রশাসনের দায়িত্বভার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে এই শর্তসাপেক্ষে দিতে হবে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইনশৃঙ্খলা ও নৈতিক দিকটা বজায় রেখে জনসাধারণকে বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতা এবং ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দেবে। এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাস ব্যবসা, অস্ত্র ব্যবসা এবং মদ্য ব্যবসার মত দুর্নীতি বন্ধ করবে ; কোন দুর্গ বা সামরিক ঘাঁটি ও নৌ-বাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করতে দেবে না এবং স্থানীয় জনসাধারণকে পুলিশের কাজে ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া ছাড়া কোন সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে পারবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার অঞ্চলগুলির নিরাপত্তা রক্ষা করবে এবং লীগের অন্যান্য সদস্যদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার সমান সুযোগ দেবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মত কিছু ভূখণ্ড আছে যেগুলিতে জনসংখ্যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার দরুন অথবা সেগুলি আকারে ছোট হওয়ার দরুন অথবা সভ্য দুনিয়ার কেন্দ্রগুলি থেকে দূরবর্তী হওয়ার দরুন অথবা লীগের কোন সদস্য রাষ্ট্রের শাসনাধীনে ভূখণ্ডের কাছাকাছি অবস্থানের দরুন এবং অন্যান্য কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন মোতাবেক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে শাসিত হওয়াই সবচেয়ে ভাল। অবশ্য স্থানীয় জনসাধারণের স্বার্থে উল্লিখিত অধিকারগুলি সুরক্ষিত করার সাপেক্ষে শাসনাধীন থাকবে।

প্রতিটি তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্রকে তার শাসনাধীন অঞ্চল সম্পর্কে কাউন্সিলের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন দিতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্রগুলি কতটা পরিমাণ কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ অথবা আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখবে সে সম্পর্কে আগে থেকে যদি জাতিসঙ্ঘের সদস্যরা একমত না হন, তাহ'লে সেই সব ক্ষেত্রে কাউন্সিলকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

বিরোধের সঙ্গে যুক্ত এক বা একাধিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা বাদে সকল সদস্যদের দ্বারা সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হ'তে পারে এমন রিপোর্ট তৈরি করতে কাউন্সিল যদি ব্যর্থ হয়, তাহ'লে লীগের সদস্যদের সত্য ও ন্যায় রক্ষার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করবে তা গ্রহণ করতে পারবে।

বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একপক্ষ যদি দাবী করে যে এটা তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং যদি কাউন্সিল দেখে, যে কারণে বিরোধের উৎপত্তি তা আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে উক্ত পক্ষের অভ্যন্তরীণ এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ছে তাহ'লে কাউন্সিল সেরূপ রিপোর্ট দেবে এবং নিষ্পত্তির ব্যাপারে কোন সুপারিশ করবে না।

এই অনুচ্ছেদ অনুসারে কাউন্সিল যে কোন অবস্থায় বিরোধের বিষয়টি সাধারণ সভার কাছে পাঠাতে পারে। বিবদমান কোন একটি পক্ষের অনুরাধে বিষয়টি সাধারণ সভার কাছে প্রেরণ করা যাবে যদি কাউন্সিলে বিষয়টি পেশ করার ১৪ দিনের মধ্যে এই অনুরোধ করা হয়।

১৬নং অনুচ্ছেদ

চুক্তিপত্রের ১২, ১৩ অথবা ১৫নং অনুচ্ছেদ অগ্রাহ্য করে লীগের কোন সদস্য যদি যুদ্ধের পথ অবলম্বন করে তাহ'লে প্রকৃত অর্থে যে লীগের সকল সদস্য রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অপরাধ করেছে বলে বিবেচনা করা হবে। এর ফলস্বরূপ তার সঙ্গে সব রকম বাণিজ্যিক ও আথিচ্ছুক সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে, লীগের সদস্য রাষ্ট্রগুলির চুক্তিভঙ্গাকারী রাষ্ট্রের সব রকম আদান-প্রদান নিষিদ্ধ করা হবে এবং সদস্যরষ্ট্র এবং চুক্তিভঙ্গাকারী রাষ্ট্রের মধ্যে আর্থিক, বাণিজ্যিক অথবা ব্যক্তিগত আদান-প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হবে। লীগের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও লীগের সদস্যরাষ্ট্রগুলি অনুরূপ ব্যবস্থা নেবে।

এক্ষেত্রে কাউন্সিলের কর্তব্য হবে লীগের চুক্তিপত্রের মর্যাদা রক্ষার জন্য লীগের সদস্যকে কতটা কার্যকরী সামরিক, নৌ অথবা বিমান বাহিনী দিয়ে সাহায্য করতে পারবে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির কাছে সুপারিশ করা।

১৭নং অনুচ্ছেদ

লীগের সদস্যরাষ্ট্র এবং লীগের সদস্য নয় এমন একটা রাষ্ট্রর মধ্যে বিরোধ বাধলে অথবা লীগের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ বাধলে, লীগ সদস্য নয় এমন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলিকে পরিষদ যা ন্যায্য মনে করবে তার ভিত্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য লীগের সদস্যপদের দায়বদ্ধতা মেনে নিতে আহ্বান জানাবে।

১৯নং অনুচ্ছেদ

যে চুক্তিগুলির আর কার্যকারিতা নেই সেই চুক্তিগুলি সম্পর্কে লীগের সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে বিচার-বিবেচনা করার জন্য সাধারণ সভা মাঝে মাঝে উপদেশ দিতে পারে এবং বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করতে পারে এমন আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্পর্কেও সাধারণ সভা সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে পরামর্শ দিতে পারে।

২১নং অনুচ্ছেদ

শান্তি রক্ষার জন্য সালিসির (মধ্যস্থতা) মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন অথবা মনরো নীতির সমতুল্য আঞ্চলিক বোঝাপড়া ইত্যাদির মত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৈধতার ব্যাপারটিকে এই চুক্তিপত্রের কোন কিছুই প্রভাবিত করতে পারে বলে বিবেচিত হবে না।

এটাও ঘোষণা করা হ'ল যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে এমন কোন পরিস্থিতি যা শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে অথবা দুই রাষ্ট্রের মধ্যেকার সু-সম্পর্ক, যার ওপর শান্তি বজায় রাখা নির্ভর করে তার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, সেই সব বিষয়ে সাধারণ সভা অথবা কাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষণে লীগের প্রত্যেক সদস্যের যুক্তিসংগত অধিকার আছে।

১২নং অনুচ্ছেদ

লীগের সদস্যরা এই বিষয়ে একমত যে যদি সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে এমন কোন বিরোধ দেখা দেয় যা ভাঙনের পথে নিয়ে যেতে পারে, তাহ'লে তারা বিরোধের বিষয়টি হয় সালিসির মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য, নয় বিচারবিভাগীয় নিষ্পত্তির জন্য অথবা কাউন্সিলের কাছে বিষয়টি অনুসন্ধান করার জন্য পেশ করবে। এবং তারা এ বিষয়েও একমত যে, সালিসি ব্যবস্থা অথবা বিচারবিভাগীয় রায় অথবা কাউন্সিলের রিপোর্ট বেরোনোর আগে কোনভাবেই যুদ্ধের পথ অবলম্বন করবে না।

১৪নং অনুচ্ছেদ

আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের জন্য স্থায়ী বিচারালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কাউন্সিল গঠন করবে এবং তা লীগের সদস্যদের কাছে পেশ করবে। বিচারালয়ের কাছে সদস্য রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক চরিত্রের যে কোন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পেশ করবে, তা শোনার এবং সে বিষয়ে রায়দানের যোগ্যতা বিচারালয়ের থাকবে।

কাউন্সিল বা সাধারণ সভা বিচারালয়ে কোন বিরোধ অথবা সমস্যা উপস্থিত করলে সেই বিষয়ে বিচারালয়ে পরামর্শ দানও করতে পারে।

১৫নং অনুচ্ছেদ

পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাঙন সৃষ্টি করতে পারে এমন বিরোধ যদি লীগের সদস্যদের মধ্যে দেখা দেয় যা ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সালিসি বিচার অথবা বিচারবিভাগীয় নিষ্পত্তির জন্য পেশ করা যায় নি, তাহ'লে লীগের সদস্যরা বিরোধের বিষয়টি কাউন্সিলে প্রেরণ করতে রাজী থাকবে। যে কোন বিরোধী পক্ষ বিরোধের বিষয়টি সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে পেশ করতে পারে ; এমতাবস্থায় সেক্রেটারী জেনারেল পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান এবং বিচার-বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করবেন।

কাউন্সিল বিরোধটি নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়াস চালাবে এবং যদি সেই প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয় তবে কাউন্সিল বিরোধের কারণ ও বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাখ্যা ক'রে এই ব্যাপারে যে সকল শর্ত আরোপ উপযুক্ত মনে করেছে এই সব বিষয়ে একটা প্রকাশ্য বিবৃতি কাউন্সিল দেবে।

যদি বিরোধটির নিষ্পত্তি এইভাবে না হয়, তাহ'লে কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিরোধের কারণগুলি দর্শিয়েও এই নিষ্পত্তির ব্যাপারে যে সুপারিশ দেওয়া ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছে এ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রকাশ করবে।

কাউন্সিলের রিপোর্টটি যদি বিরোধের সঙ্গে যুক্ত এক বা একাধিক গোষ্ঠী বাদে কাউন্সিলের অন্যান্য সকল সদস্য সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করে নেয়, তাহলে লীগের সদস্যরা রিপোর্টের সুপারিশ মেনে বিরোধের সঙ্গে যুক্ত এমন কোন গোষ্ঠীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ না দিতে রাজী থাকবে।

৫.৫ জাতিসঙ্ঘের চুক্তিপত্র ও তার উদ্দেশ্য এবং আদর্শ

১নং অনুচ্ছেদ

সংযোজনে উল্লেখিত হয়নি এমন যে কোন পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র, অধিরাজ্য অথবা উপনিবেশ যদি লীগের সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি পায় তাহ'লে সেই রাষ্ট্র লীগের সদস্য হ'তে পারে ; তবে শর্ত থাকবে যে ঐ রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালনে আন্তরিক সদিচ্ছা প্রকাশ করতে হবে এবং লীগ যদি ঐ রাষ্ট্রর সামরিক, নৌ ও বিমানবাহিনী এবং সমরাস্ত্রের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রয়োগ করে তাহ'লে তা মেনে নিতে হবে।

৪নং অনুচ্ছেদ

কাউন্সিল প্রতিনিধিত্ব করে না এমন কোনো লীগের সদস্যরাষ্ট্রের স্বার্থবিষয়ক কোন বিষয় আলোচনার সময়ে লীগের ঐ সদস্যরাষ্ট্রকে কাউন্সিলে সদস্য হিসাবে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

৫নং অনুচ্ছেদ

এই চুক্তিপত্রে অথবা বর্তমান চুক্তির শর্তাবলীর মধ্যে অন্যত্র যা পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে তা বাদে সাধারণ সভা অথবা কাউন্সিলের যে কোন সভায় লীগের সকল সদস্য, যারা ওই সভায় প্রতিনিধিত্ব করছে, তাদের ঐক্যমত প্রয়োজন।

কোন বিশেষ ব্যাপারে অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগসহ সাধারণ সভা অথবা কাউন্সিলের সভার যাবতীয় কার্যপ্রণালী সাধারণ সভা অথবা কাউন্সিলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা গৃহীত হবে।

৮নং অনুচ্ছেদ

শান্তি রক্ষার ব্যাপারে সমরাস্ত্রের পরিমাণ জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে নিম্নতম পর্যায়ে কমিয়ে আনার এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পালনে যৌথকর্মসূচী বলবৎকরণের প্রয়োজনীয়তা লীগের সকল সদস্য স্বীকার করে নিচ্ছে।

১০নং অনুচ্ছেদ

বহিঃআক্রমণের বিরুদ্ধে লীগের সকল সদস্য রাষ্ট্রের বর্তমান রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার ব্যাপারটি সকল সদস্য মান্য করবে ও সংরক্ষিত করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এরকম কোন আক্রমণ ঘটলে অথবা এই জাতীয় আক্রমণের কোন আশঙ্কা দেখা দিলে কিভাবে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পালন করা হবে কাউন্সিল সে ব্যাপারে পরামর্শ দেবে।

১১নং অনুচ্ছেদ

লীগের কোন সদস্য রাষ্ট্র তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করুক বা না করুক, সমস্ত লীগ সদস্য এই মর্মে ঘোষণা করবে যে কোন যুদ্ধ বা যুদ্ধের আশঙ্কাকে তারা গভীর উদ্বেগের কারণ হিসাবে দেখবে এবং ঐ রাষ্ট্রগুলির শান্তি রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা লীগ যুক্তিপূর্ণ ও কার্যকরী বলে মনে করবে তা গ্রহণ করবে। যদি এমন ঘটনা দেখা দেয় তাহ'লে লীগের সদস্যদের অনুরোধে সেক্রেটারী জেনারেল অবিলম্বে কাউন্সিলের সভা ডাকবে।

প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আন্তর্জাতিকতাবাদের সূচনা করেছিল। ১৯১৮ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের বিখ্যাত চৌদ্দ দফা শর্তে উল্লিখিত হয়েছিল যে ছোট বড় রাষ্ট্রগুলির আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি সাধারণ সমিতি স্থাপিত হবে। এরই ফলস্বরূপ আত্মপ্রকাশ করে জাতিসঙ্ঘ বা লীগ অফ নেশনস। স্বভাবতই এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল শান্তিরক্ষা, আলোচনা ও আপোসের দ্বারা আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা এবং পৃথিবীতে পুনরায় যুদ্ধের পরিস্থিতির যাতে সৃষ্টি না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫.২ জাতিসঙ্ঘ— 'একটি শক্তিশালী হাতিয়ার'

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নেপোলিয়ানের পতনের পর পবিত্র সংঘ ও ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমবায় গঠনের মধ্যে দিয়ে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভের প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে কোন বিবাদ শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য এক বিশ্ব সংস্থার প্রয়োজন, তা সকল রাষ্ট্রনীতিবিদই উপলব্ধি করেছিলেন। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে তাই জাতিসঙ্ঘ ছিল একটি "milestone"। যুদ্ধক্ষত, হতাশাগ্রস্ত মানুষের মন থেকে যুদ্ধ ভীতি দূর করে নিরাপত্তাবোধ জাগিয়ে তুলতে, আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করতে এবং শান্তির বাতাবরণ রক্ষার্থে জাতিসঙ্ঘ হয়ে উঠেছিল এক শক্তিশালী হাতিয়ার (Potent instrument)।

৫.৩ জাতিসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক পটভূমি

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই সমগ্র ইউরোপ দুটি সশস্ত্র শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এই সময়কালে সাধারণ মানুষ এবং রাষ্ট্রনীতিবিদ সকলেরই মনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থায়ী শান্তি সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছিল, এরই ফলে ১৮৯৯ ও ১৯০৭ সালের হেগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (The Hague Peace Conference)। হল্যাণ্ডের হেগ শহরে অনুষ্ঠিত দুটি সান্তি সম্মেলনে স্থায়ীরূপে একটি জাতিসঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব আলোচিত হয়। তবে আলোচনা ফলপ্রসূ হবার পূর্বেই সংঘটিত হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তাই যুদ্ধ সমাপ্তির জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি যে চৌদ্দ দফা প্রস্তাব এনেছিলেন তার চতুর্দশ দফাটি ছিল একটি বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানরূপে জাতিসঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব। রণক্লান্ত পৃথিবী এই সময়ে শান্তির আকাঙ্ক্ষায় এই প্রস্তাব সমর্থন করে। ১৯১৯ সালে ভার্সাই সন্ধিতে জাতিসঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করা হয়। যে দলিলটিতে জাতিসংঘের উদ্দেশ্য, গঠনবিধি বিধৃত করা হলো তা চুক্তিপত্র বা কভেনান্ট (League Covenant) নামে পরিচিত হ'ল। ভার্সাই সন্ধির ভিতর লীগ অফ নেশনসের চুক্তিপত্র জাতিসঙ্ঘের ভার্সাই সন্ধির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৫.৪ ব্রিটেন ও আমেরিকার ভূমিকা

জাতিসঙ্ঘ বা লীগ অফ নেশনসের চুক্তিপত্রে প্রাধান্য পেয়েছিল আমেরিকা ও ব্রিটেনের মতবাদ। (আমেরিকার নীতি ও ইংল্যাণ্ডের আইনগুলি লীগ কভেন্যান্টে সংকলিত হয়) "America supplied the principle, British the leagal frame work" প্রকৃতপক্ষে লীগ চুক্তি পত্রে ইঙ্গ-মার্কিন মতের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল।

৫.৬.১৪ ইটালির ইথিওপিয়া অভিযান
৫.৭ লীগ অফ নেশনসের অন্যান্য কার্যাবলী
৫.৭.১ জাতিসঙ্ঘ ও বিশ্বশান্তি
৫.৭.২ অর্থনৈতিক পুনর্গঠন
৫.৭.৩ সামাজিক ও মানসিক উন্নয়ন
৫.৮ জাতিসঙ্ঘের কৃতিত্ব
৫.৯ জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার কারণ
৫.১০ জাতিসঙ্ঘের কার্যাবলীর মূল্যায়ন
৫.১১ সারাংশ
৫.১২ অনুশীলনী
৫.১৩ গ্রন্থাবলী

৫.০ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন পরিস্থিতিতে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনের প্রয়াস আলোচিত হয়েছে। এই কর্মপ্রচেষ্টার দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছিল জাতিসঙ্ঘ বা লীগ অফ নেশনসের উপর। এই এককটি পাঠ করে আপনারা যে বিষয়গুলি জানতে পারবেন তা নিম্নে বর্ণিত হল।

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃহৎ শক্তিবর্গের নেতৃত্বে জাতিসংঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা।
- জাতিসংঙ্ঘের শান্তি-নিরাপত্তা ও সহযোগিতা স্থাপনের উদ্দেশ্য বিভিন্ন সংস্থার স্থাপন।
- রাজনৈতিক সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা।
- যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন।
- জনকল্যাণ মুখী পরিকল্পনা।
- লীগের কার্যাবলীর মূল্যায়ন।
- লীগের ব্যর্থতা।

৫.১ প্রস্তাবনা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল এক সর্বাত্মক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। এমন ব্যাপক যুদ্ধ ইতিপূর্বে সংঘটিত হতে দেখা যায়নি। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত চার বছরের সময়কালে অসংখ্য মানুষের জীবনহানি ঘটেছিল, ধ্বংস হয়েছিল বিশ্বের অর্থনৈতিক সম্পদ এবং পরিবর্তিত হয়েছিল বিশ্ব রাজনীতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্য ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে এখানে দেখা দিল রাজনৈতিক শূন্যতা। জার্মানির পরাজয়ের পর শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে রাজনৈতিক অস্থরতা নিরসনের জন্য, পৃথিবীকে আগামী যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিবদমান সব রাষ্ট্রগুলি নিজ প্রয়োজনের তাগিদে সম্মিলিত হ'ল।

একক ৫ ❑ জাতিসঙ্ঘ বা লীগ অফ নেশনস : শান্তির প্রয়াস ও ব্যর্থতা

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ জাতিসঙ্ঘ—'একটি শক্তিশালী হাতিয়ার'

৫.৩ জাতিসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক পটভূমিকা

৫.৪ ব্রিটেন ও আমেরিকার ভূমিকা

৫.৫ জাতিসঙ্ঘের চুক্তিপত্র ও তার উদ্দেশ্য এবং আদর্শ

- ৫.৫.১ যৌথ নিরাপত্তা
- ৫.৫.২ জাতিসঙ্ঘের কর্মপ্রয়াস
- ৫.৫.৩ জাতিসঙ্ঘের সভ্যপদ
- ৫.৫.৪ জাতিসঙ্ঘের গঠন
- ৫.৫.৫ জাতিসঙ্ঘের প্রকৃতি

৫.৬ জাতিসঙ্ঘের কার্যকলাপ

- ৫.৬.১ জাতিসঙ্ঘের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা
- ৫.৬.২ ইউপেন ও মামেডি
- ৫.৬.৩ অল্যান্ড দ্বীপ সমস্যা
- ৫.৬.৪ পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়া বিরোধ
- ৫.৬.৫ কর্ফু বিরোধ
- ৫.৬.৬ সাইলেশিয়ার সমস্যা
- ৫.৬.৭ তুরস্ক-ইরাক বিবাদ
- ৫.৬.৮ আর্মেনিয়া-তুরস্ক বিবাদ
- ৫.৬.৯ যুগোশ্লাভিয়ার আক্রমণ
- ৫.৬.১০ গ্রীস-বুলগেরিয়া সংঘর্ষ
- ৫.৬.১১ কলম্বিয়া-পেরু বিবাদ
- ৫.৬.১২ ইঙ্গ-ফরাসি বিবাদ
- ৫.৬.১৩ মাঞ্চুরিয়া সমস্যা

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। আইশাখ ডয়শ্চার *'স্টালিন এ পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফি'* (১৯৩৯)।

২। এইচ. বি. পার্কস *'দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা'* (১৯৬৭)।

৩। আকিরা ইরি (Akira Iriye) *'দ্য কেম্ব্রিজ হিস্টরি অফ আমেরিকান ফরেন রিলেশনস'*, তৃতীয় খণ্ড, *'দ্য গ্লোবালাইজিং অফ আমেরিকা'*, (১৯৩৩)।

৪। অ্যান্ড্রু জে. ক্রোজিয়ার *'দ্য কসেস অফ দ্য সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার'* (১৯৯৭)।

৫। উইলিয়াম আর কেইলর, *'দ্য টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ওয়ার্ল্ড'* (২০০১)।

সোভিয়েত সরকারের আশা ছিল দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আহ্বান জানালেই বিপ্লব আরম্ভ হয়ে যাবে। ধনতন্ত্রের অবসান ঘটবে।

কিন্তু ১৯২০ সালের পর প্রমাণ হয় বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্নপূরণ হবে না। তখন সোভিয়েত সরকার ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরোধকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়ে ওঠে। প্রথমেই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জার্মানি। প্রথমে বাণিজ্য চুক্তি তারপর কূটনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এর পাশাপাশি মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলিও সোভিয়েত ইউনিয়নকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়। ১৯২৭ সালে লিটভিনভ নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এরপর রাশিয়া লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯২৮ সালে কেলগ-ব্রিঁয়া চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীরূপে সোভিয়েত ইউনিয়ন কূটনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে যুদ্ধকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৩৩ সালে নাৎসি বিপ্লবের পর ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত স্টালিন বিজয়ী ত্রিশক্তির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে অগ্রসর হয়। ১৯৩৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়া লীগে যোগদান করে এবং লীগের কাজে যোগদান করে। ১৯৩৫ সালের মে মাসে সোভিয়েত রাশিয়া ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

কিন্তু ফ্রান্স ও স্পেনে পপুলার ফ্রন্ট সরকার স্থাপন ও সাম্যবাদের প্রসারের ফলে মিত্রশক্তি রাশিয়া সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তোষণ নীতির নীরব দর্শক রূপে দেখে কীভাবে ইংলন্ড ফ্রান্স ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলিকে তোষণ করে যাচ্ছে।

১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে মিত্রপক্ষের সঙ্গে কূটনৈতিক ও সামরিক চুক্তিস্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় দুই সীমান্তে আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৯ সালের আগস্টে স্টালিন সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ হয়।

কিন্তু ১৯৪১ সালে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করে। অবশেষে সাম্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির জোট গড়ে ওঠে (Grand Alliance)। হিটলারের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। কিন্তু এর পরেই মহান মৈত্রী ভেঙে যায়। পৃথিবী ভাগ হয়ে যায় ঠান্ডা লড়াইয়ের দুই নেতার নেতৃত্বে।

৪.৬ অনুশীলনী ঃ প্রশ্নাবলি ও উত্তর-সংকেত

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। মনরো-নীতির সঙ্গে ল্যাতিন আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর পররাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক কি?
উত্তর ঃ ৪.২.৩

২। ওয়াশিংটন সম্মেলন দূরপ্রাচ্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কতটা সফল হয়েছিল?
উত্তর ঃ ৪.২.৪

৩। সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির আদর্শবাদের পর্ব সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?
উত্তর ঃ ৪.৩.১

৪। ১৯২২ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যবর্তী পর্বে রুশ-জার্মান সম্পর্কের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
উত্তর ঃ ৪.৩.২ ও ৪.৩.৩

এই মৈত্রী শেষ পর্যন্ত পৃথিবী থেকে একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটালেও এই মৈত্রী কখনই দৃঢ়ভিত্তিক ছিল না। রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তির পতনের পরেই এই মৈত্রীব্যবস্থার ফাটলগুলি বড় হয়ে ওঠে।

উষ্ম যুদ্ধের অবসানে পৃথিবী জড়িয়ে পড়ে ঠাণ্ডা লড়াইতে। ইউরোপীয় প্রাধান্যের অবসানে রুশ-মার্কিন বিরোধ পৃথিবীকে ভাগ করে দ্বিপাক্ষিক দুনিয়ার।

৪.৫ সারাংশ

১৮২৩ সালের মনরো ঘোষণার পর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন ইউরোপীয় শক্তিগুলিকে পশ্চিম গোলার্ধে হস্তক্ষেপ করতে দিতে চায়নি, তেমনি, ইউরোপীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তেও চায়নি।

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হয়। উড্রো উইলসন প্রবর্তিত চৌদ্দ দফা নীতি ও লীগ চুক্তিপত্রই রচনা করে ভবিষ্যৎ শান্তির ভিত্তি।

শেষপর্যন্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নতাবাদী মতবাদ শক্তিগুলি হয়ে ওঠে এবং মার্কিন সেনেট ভার্সাই চুক্তি ও লীগ চুক্তিপত্র অনুমোদনে অস্বীকার করেন।

কিন্তু ইয়োরোপীয় ক্ষতিপূরণ সমস্যা ও নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল, হয়ে উঠেছিল অর্থনৈতিক নিয়ন্তা।

১৯২৯ সালে শেয়ার বাজারে ধ্বস্ মার্কিন অর্থনীতি তথা বিশ্ব অর্থনীতিকে ধ্বংসের সম্মুখীন করে। নব নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট 'নিউডীল' নীতির মাধ্যমে অর্থনীতিকে বাঁচানোর চেষ্টায় ব্রতী হন।

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও লাতিন আমেরিকায় 'নিখিল মার্কিনবাদ' (Pan Americanism) এবং পশ্চিম গোলার্ধের সংহতির (hermispheric solidarity) নামে মার্কিন পুঁজি ও সামরিক প্রভাব বিস্তার চলতেই থাকে।

অবশেষে ১৯৩৩ সালে 'সৎ প্রতিবেশী' নীতি (good neighbour policy) গৃহীত হয়। অক্ষশক্তির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দুই মহাদেশের নিরাপত্তা রক্ষা করা হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে লাতিন আমেরিকাকে পুরোপুরি মার্কিন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূর প্রাচ্যে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। রুজভেল্ট চীনকে সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। আবার উদারনৈতিক মার্কিন কুটনৈতিকরা চীনকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। অবশেষে ১৯২৭ সালে লানসিং-ইশি চুক্তি অনুসারে চীনের সংহতি স্বীকার করে নেওয়া হয়, আবার মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে জাপানের প্রভাব স্বীকার করে নেওয়া হয়। (১৯২১-২২) ওয়াশিংটন সম্মেলনে জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা প্রশান্ত সাগর অঞ্চলে নৌ-অস্ত্র হ্রাসের জন্য মিলিত হন।

১৯৩১ সালে জাপান যৌথ নিরাপত্তার বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে। চীনের শত অভিযোগ সত্ত্বেও লীগ জাপানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের চেয়ে অধিক পরিমাণ নৌ-শক্তির অধিকারী হওয়ায় সে জাপানের শক্তিবৃদ্ধি সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল। তাছাড়া, জাপানের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক সম্পর্কের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা নিতে প্রস্তুত ছিল না। এর ফলে সামগ্রিকভাবে যৌথ নিরাপত্তাব্যবস্থার অবনতি ঘটে। একনায়কতান্ত্রিক শক্তিগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটে।

১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর লেনিন ১৯১৮ সালে জার্মান সরকারের সঙ্গে ব্রেস্টলিটভস্কের চুক্তির মাধ্যমে বিশাল অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে শান্তিস্থাপন করেন। বিপ্লবী আদর্শবাদই, ছিল লেনিনীয় পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র।

চুক্তি সম্পাদনে উদাসীনতা দেখিয়েছিল। বিভিন্ন নথিপত্র থেকে প্রমাণ করা যায় পাশ্চাত্য গণতন্ত্রগুলিই Grand Alliance-র ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল। রাশিয়ার পক্ষেও কার্যত কোনো বিকল্প পথ খোলা ছিল না।

আপাতদৃষ্টিতে অনাক্রমণ চুক্তিকে বিশ্বাসঘাতকতা মনে হলেও, রুশ-জার্মান মৈত্রীর এক দীর্ঘ ইতিহাস ছিল। বিংশ শতকের গোড়ায় ১৯১৪ সালে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম একবার রুশ মৈত্রীকে অস্বীকার করেছিলেন। আর ১৯৪১ সালে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেছিলেন। দুটি ক্ষেত্রেই জার্মানির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘোষিত নীতি অনুসারে সে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার মৌলিক বিরোধকে কাজে লাগিয়ে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। ১৯২১ থেকে' ২৭ সালের মধ্যে সোভিয়েত-জার্মান বন্ধুত্ব ঘনীভূত হয়। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৯ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্রপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। ১৯৩৯ সালের আগস্ট থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত-জার্মান মিত্রতার যুগ চলেছিল।

অধ্যাপক এ.জে.পি টেলরের মতে, হিটলার ও স্টালিন দুজনেরই ধারণা হয়েছিল যে তাঁরা এই চুক্তির সুবাদে আগত যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রতিহত করতে পারবেন। হিটলার ভেবেছিলেন এই চুক্তির মাধ্যমে তিনি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবেন। স্টালিনও ভেবেছিলেন রাশিয়া সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু বাস্তবে হিটলার-স্টালিন অনাক্রমণ চুক্তি যুদ্ধকে প্রতিহত না করে যুদ্ধের আগমনকে ত্বরান্বিত করেছিল। ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোলাণ্ড আক্রমণ করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোলাণ্ডের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য জার্মানির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে ৩ সেপ্টেম্বর।

এই অনাক্রমণ চুক্তির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের একাকীত্বের অবসান ঘটে। এই চুক্তি একদিকে পশ্চিমি গণতন্ত্রের ভ্রান্ত পররাষ্ট্রনীতির অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করে। জার্মানি সাময়িকভাবে পশ্চিমি গণতান্ত্রিক বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এল। সব মিলিয়ে নীতিগতভাবে কমিউনিস্ট বিরোধী জোটেও ফাটল ধরেছিল।

৪.৩.৪ গ্রান্ড আলায়েন্স

রুশ-জার্মান অনাক্রমণচুক্তি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। ১৯৪১ সালের ২২ জুন জার্মানি এই অনাক্রমণ চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করে।

বাস্তবিক রুশ আক্রমণের পরিকল্পনা (Operation Barbarossa) নেওয়া হয়েছিল। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর। আক্রমণ কার্যকর করতে ছয় মাস কেটে যায়। '৪০ থেকে '৪১ সালের মধ্যে রুশ-জার্মান সম্পর্কে দ্রুত অবনতি ঘটে। জার্মানরা বিশ্বাস করত ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা স্টালিনের উচিত হয় নি। তারা খোলাখুলি ফিনল্যান্ডের প্রতি তাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিল। স্টালিন পূর্ব ইয়োরোপের রাজ্যাংশ পেয়ে সন্তুষ্ট হননি। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানি, জাপান এবং ইতালি ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। রুশ দাবি মানা না হলে মলোটভ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন। অধ্যাপক আই. গ্রে-র মতে, এই আলোচনার পরেই হিটলার ১৯৪১ সালে রুশ আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

স্টালিন বহু সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করেছিলেন। যখন আক্রমণের সংবাদ এল তখন রুশবাহিনী সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। স্টালিন একদিকে এই আক্রমণের উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শক্তিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ১৯৪১ সালে ইঙ্গ-সোভিয়েত পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি (Mutual Assistance Pact.) স্বাক্ষরিত হল। ১৯৪২ সালে সম্পাদিত হল ২০ বছর স্থায়ী ইঙ্গ-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তি। যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করল তখন ইংলন্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিয়ে গ্র্যাণ্ড আলায়েন্স স্থাপিত হল। এই মৈত্রীর মূল উদ্দেশ্য ছিল নাৎসিবাদের পতন ঘটানো।

বেশি প্রয়োজন। স্টালিন মেইন ক্যাম্ফ (Mein Kampf)-এর কেন্দ্রীয় যুক্তি বুঝতে পারেননি, তাহলে তিনি কখনই অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করতেন না।

১৯৩৮ সালের শীতকালে কয়েকজন সোভিয়েত পদাধিকারী জার্মানির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। অনেকে এই প্রচেষ্টাকে সোভিয়েতের অশুভ শক্তির পরিচায়ক বলে বোধ করেন। কার্যত মিউনিখের পর যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার ফলে তারা একটি বিকল্প পথ খোলা রাখার চেষ্টা করেছিল। মাত্র ১৯৩৯ সালের ১০ মার্চ স্টালিনের বক্তৃতায় এই দোলাচলের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ঘোষণা করেন সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি মতাদর্শগত নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তি চায় এবং বিদেশি রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। তোষণ নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। কিন্তু ইংরেজ কূটনীতিজ্ঞরা বুঝতে পারেননি সোভিয়েত ইউনিয়ন কীভাবে এই ঘোষণাকে কাজে লাগাবে।

এপ্রিলের গোড়ায় Karl Schnurre নামক বার্লিনের কে মাঝারি ধরনের জার্মান কূটনীতিকে সোভিয়েত জার্মান সম্পর্কের উন্নতির উল্লেখ করলেন। ১৯৩৯ সালের মার্চের শেষ থেকেই জার্মান ও সোভিয়েত প্রতিনিধিদের মধ্যে মতবিনিময় আরম্ভ হয়েছিল। ৩ মে, ইহুদি লিটভিনভকে পদচ্যুত করা হয়। তাঁর জায়গায় আসেন Mootov। মে মাসের শেষে সোভিয়েত জার্মান অর্থনৈতিক আলোচনা আরম্ভ হয়। ১৯ আগস্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৩ আগস্ট নাৎসি সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

খোলাখুলিভাবে বলা হয় উভয়পক্ষ একে অন্যকে আক্রমণ করবে না বা কোনো আক্রমণকারি তৃতীয় পক্ষকে সমর্থন করবে না। এটি দশ বছর স্থায়ী ছিল। এই চুক্তির গোপন ধারাগুলিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। জার্মান ও সোভিয়েত প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলিকে বিভাজন করে নেওয়া হয়। পিসা, নারেভ, ভিশ্চুলা এবং সান নদী ধরে পোলন্ড বিভাজন করা হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনলান্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া এবং রুমানিয়া বেসারাবিয়া প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। তখনকার মতো লিথুয়ানিয়াতে জার্মান প্রভাব স্বীকার করে নিলেও শেষ পর্যন্ত লিথুয়ানিয়াও সোভিয়েত প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে।

যেহেতু ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের সঙ্গে এক অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তার পক্ষে দুই সীমান্তে আক্রমণ সহ্য করা সম্ভব ছিল না। এছাড়া জার্মান প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল। এই চুক্তির মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরোধকে কাজে লাগিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন শক্তি অর্জন করতে পারত। এবং পূর্ব ইউরোপ ও বাল্টিক অঞ্চলে তার সীমানা বিস্তার হত। ইংলন্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুত্বের অনিশ্চিতির পরিবর্তে স্টালিন হিটলারের সঙ্গে নিশ্চিত সম্পর্ককে বেছে নিলেন ("Stalin opted for certainties of an accomodation with Hitler, rather than the uncertainties of a tie with Britain and France.")

পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির দুই দিক থেকে সমালোচনা করেছে। এস. মরিস প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে, পাশ্চাত্য শক্তি গুলি যখন নাৎসিবাদকে ঠেকানোর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল সেই সময় সহসা হিটলারের সঙ্গে আক্রমণচুক্তি স্বাক্ষর করে স্তালিন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

নীতির দিক থেকে সাম্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একনায়কতান্ত্রিক জার্মানির বন্ধুত্বস্থাপন ছিল নিতান্ত অযৌক্তিক।

উপরোক্ত সমালোচনার বিরুদ্ধে অধ্যাপক টেলর দেখিয়েছেন মিউনিখ চুক্তির কর্মকর্তাদের মুখে সমালোচনা শোভা পায় না। আক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পশ্চিমি গণতন্ত্রগুলি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে

পার্টিগুলিকে সাহায্য করতে নিষেধ করা হয়। ট্রটস্কি তাঁর সুদূর নির্বাসন থেকে এই নীতির বিপদ সম্পর্কে বারে বারে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে সোশাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে কার্যকার সমঝোতার মধ্যে দিয়েই জয়লাভ করা সম্ভব। তিনি বলেছিলেন "ত্বরা কর! তোমার হাতে সময় খুব অল্প!" "Make haste, you have very little time left !" ট্রটস্কির ভবিষ্যৎবাণী সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

স্টালিন ক্রমশ তাঁর ভ্রান্তি বুঝতে পারেন। নাৎসিপন্থা যে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের তুলনায় অনেক বেশি বিপজ্জনক তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার ফলে ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন লীগে প্রবেশ করেছিল। ১৯৩৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করলেও, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক কখনই হার্দিক হয়ে ওঠে নি। জেনেভা সম্মেলনে লিটভিনভ যৌথ নিরাপত্তার জয়গান গাইলেও মিউনিখ সম্মেলনে রাশিয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সোভিয়েত সরকার সত্যিই-চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করতে চায় কিনা তা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া, বিভিন্ন দেশ তাদের জমির উপর দিয়ে সোভিয়েত বাহিনীকে যাতায়াত করতে দেবে কিনা, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। পোলাণ্ড ও রুমানিয়ার আশঙ্কা ছিল তাদের সীমানার ভিতর দিয়ে সোভিয়েত সেনা গেলে তারা থেকেই যাবে। রুমানিয়া একটি মাত্র ছাড় দিয়েছিল, ৩০০০ মিটারে ওপর দিয়ে সোভিয়েত বিমান ওড়ার অনুমতি দিয়েছিল।

১৯৩৯ সালে এপ্রিল থেকে আগস্টের মধ্যে ব্রিটিশ, ফরাসি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে নাৎসি আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে একটি মৈত্রী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছিল। ১৪ এপ্রিল ইংলন্ড সোভিয়েত ইউনিয়নকে জানায় কোনো আক্রমণ ঘটলে সে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। এর উত্তরে ১৮ এপ্রিল সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্ভাব্য আক্রমণের সামনে পোলাণ্ড ও রুমানিয়াকে রক্ষা করার জন্য ইংলন্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার এক মৈত্রী চুক্তির প্রস্তাব করে। এই মৈত্রীর পাশাপাশি সামরিক প্রস্তুতির কথাও বলা হয়েছিল। ফরাসিরা সোভিয়েত প্রস্তাবে রাজী ছিল কিন্তু ইংলন্ড মনস্থির করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত, ইংরেজ সরকার সোভিয়েত প্রস্তাব মেনে নেয়। ঠিক হয় প্রথমে রাজনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে তারপর ২৩ জুলাই সামরিক কথাবার্তা শুরু হবে। কিন্তু এই আলাপ আলোচনার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবার আগে পরোক্ষ আক্রমণের সমস্যার সমাধান হয়নি। ব্রিটিশ সরকার কোনো মতেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে দিতে প্রস্তুত ছিল না। বিশেষত, বাল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলি সহজেই রুশ আগ্রাসনের শিকার হতে পারত। ইংরেজরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক দৌত্য প্রেরণে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। তাদের ইচ্ছে ছিল সামরিক আলাপ আলোচনার সম্পন্ন হবে। অথচ সোভিয়েত ইউনিয়ন যুগপৎ রাজনৈতিক চুক্তি এবং সামরিক আলোচনা সম্পন্ন করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত, একটি ইঙ্গ ফরাসি দৌত্য ১১ আগস্ট মস্কো এসে পৌঁছায়। যানবাহনের বিলম্বিত গতি ও বিমানের পরিবর্তে জাহাজ ব্যবহার রুশরা ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। Admiral Sir Reginald Plunkett-Krule Drax যথেষ্ট রাজনৈতিক বিচক্ষণ সম্পন্ন ব্যক্তি হলেও, নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক কারণে দ্রুতগামী বিমানের পরিবর্তে ধীরগামী জলপোত বেছে নেওয়া হলেও এই দৌত্যের তাৎক্ষণিক চুক্তি সম্পাদনের কোন অধিকার ছিল না।

কাজেই যখন ১২ আগস্ট দ্বিপাক্ষিক আলোচনা আরম্ভ হল, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ইংলন্ডের উৎসাহের অভাব অনুভব করেছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, ইংলন্ড ও ফ্রান্স পোলাণ্ডকে তার সীমানার ভিতর দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাহিনী নিয়ে যাবার প্রশ্নে রাজি করাতে পারে নি। ইংলন্ডের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল, তারা ইঙ্গ-ফরাসি সোভিয়েত চুক্তি সম্পাদনে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল, তারা মনে করেছিল তাদের ইংলন্ডকে যত প্রয়োজন, ইংলন্ডের তাদের আরও

১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত স্টালিন বিজয়ী মিত্রশক্তির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে অগ্রসর হন। রুশ জার্মান মৈত্রীর সাময়িক অবসান ঘটে। নিম্নলিখিত কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রমশ জার্মান বন্ধুত্ব সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। প্রথমত, জার্মান রাষ্ট্রের চ্যান্সেলর পদে ক্রমশ অধিকতর দক্ষিণপন্থী ব্যক্তি নিযুক্ত হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়। নাৎসি নেতাদের সোভিয়েত বিরোধী কুৎসা সোভিয়েত—জার্মান সম্পর্ককে শীতল করে তোলে। এ্যালফ্রেড রোসেনবার্গের চারপাশের লোকজনেরা ছিলেন নির্দিষ্টভাবে সোভিয়েত বিরোধী। সোভিয়েত বিরোধী প্রচারের মাধ্যমেই নাৎসিবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়োরোপের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের মন জয় করতে পেরেছিল।

দ্বিতীয়ত, জার্মানির সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠার প্রমাণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নব নিযুক্ত জাপানী রাষ্ট্রদূতকে হিটলার উষ্ম অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এছাড়া, জার্মানি পূর্ব ইউরোপীয় মৈত্রীগুলির চূড়ান্ত বিরোধিতা করেছিলেন। জাপ-জার্মান মৈত্রীচুক্তির সম্ভাবনা সোভিয়েত সরকারকে সদা সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল।

রুশ পররাষ্ট্রনীতির দিক পরিবর্তনের প্রধান ঘটনা পোল-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (জানুয়ারি, ১৯৩৪) স্বাক্ষর। সোভিয়েত ইউনিয়ন এতদিন পর্যন্ত পোলাণ্ডের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, সে ক্ষেত্রে গভীর বাধার সৃষ্টি হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় সোভিয়েত সীমান্তে জার্মান আক্রমণের ভীতি এসে পৌঁছয়। মিত্রপক্ষের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন গত্যন্তর ছিল না। তবে, এক্ষেত্রেও সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি লেনিন নির্ধারিত পথেই অবিচল ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এক ধনতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে অপর ধনতান্ত্রিক পক্ষকে সমর্থন করেছিল।

১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়া লীগে যোগদান করে এবং লীগের কার্যাবলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। ১৯৩৫ সালের মে মাসে সোভিয়েত রাশিয়া ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিষ্ণু উল্লেখ করা দরকার, এই পরবর্তী মৈত্রী—চুক্তিগুলি সোভিয়েত-জার্মান মৈত্রীর মতো উষ্মতা কখনই অর্জন করতে পারেনি।

ফ্রান্স ও স্পেনে পপুলার ফ্রন্ট সরকার কায়েম হওয়ায় এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে সাম্যবাদের পুনরাবির্ভাবের ফলে, এই দেশগুলির গণতান্ত্রিক গোষ্ঠী সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন নীরব দর্শক হয়ে দেখে কীভাবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলির প্রতি তোষণ নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। যখনই সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবাদী প্রতিহত করার জন্য পশ্চিমি শক্তিগুলিকে অনুরোধ জানিয়েছিল তখনই তা প্রত্যাখ্যাত হয়। এছাড়া, স্তালিন তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন, কেবলমাত্র ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একজোট হলেও হিটলারের আগ্রাসনকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

৪.৩.৩ হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি

১৯২৭ সালের পর থেকে নানান আন্তর্জাতিক প্রতিঘাত স্টালিনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। তিনি মূলত রাশিয়ার সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই সোভিয়েত রাশিয়া নিজের নিরাপত্তারক্ষার জন্য একটি নিরাপদ ও নিষ্ক্রিয় পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়। এই আপেক্ষা করার রাজনীতি অনুসরণ করতে গিয়ে স্টালিন হিটলারের ও নাৎসিবাদের অভ্যুত্থানের প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন নি।

১৯৩০ থেকে ৩৩ সালের মধ্যে হিটলার বহুবার ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। স্টালিনের চোখে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট এবং নাৎসি উভয় দলই ছিল বিপ্লববিরোধী। এবং দুটি দলের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। সেই কারণেই, জার্মান কমিউনিস্টদের হিটলারের বিরুদ্ধে সোশাল ডেমোক্র্যাট বা অন্যান্য মধ্যপন্থার

জন্যই আমরা বেরিয়ে আসব।" ("If war begins ... we shall have to come out in order to throw the decisive weight on the scales.**)

১৯২৭ সালের আগে পর্যন্ত, ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার দৃষ্টিতে স্টালিন ছিলেন নরমপন্থার প্রতীক। ট্রটস্কির বিপ্লবপন্থার পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক বিশ্ব স্বাভাবিকভাবেই স্টালিনের বিচক্ষণতাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিল। ১৯২৪ সালে সোভিয়েত সরকার ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী এবং গ্রীসের স্বীকৃত অর্জন করে। স্টালিন আশা করেছিলেন, বিদেশি, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির মাধ্যমে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে মতামত তৈরি করতে পারবেন। চীনে তিনি মধ্যপন্থা অনুসরণের পথে চলেছিলেন। ট্রটস্কির বিশ্বাস ছিল, চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রাক্‌বিপ্লব রুশ পরিস্থিতির অনুরূপ অর্থাৎ-বিপ্লবাত্মক। স্টালিনের মতে একটি সংকীর্ণ গোষ্ঠীর সমর্থনে গঠিত কমিউনিস্ট সরকারের তুলনায় বিভিন্ন বিপ্লব অনুরাগী পার্টির সমন্বয়ে গঠিত রাজনৈতিক ফ্রন্টের সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাই তিনি মাও সে তুংকে চিয়াং-কাই শেকের কুয়োমিনতাং পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। অধ্যাপক আইশ্যাক ডয়েশ্চার (I. Deutscher) মনে করেন, ১৯২৩ সালের শেষে যে পশ্চিমি দুনিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিপ্লবী বলে পরিত্যাগ করেছিল, সেই পশ্চিমি দুনিয়াই ১৯২৭ সালে আপোষকারি রূপে সোভিয়েত ইউনিয়নকে মেনে নেয়।

কিন্তু ১৯২৭ সালের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে নানা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছিল। প্রথমত, ইতালি বেসারাবিয়া কনভেনসন অনুসারে বেসারাবিয়া অধিগ্রহণকে বৈধতা দান করে। দ্বিতীয়ত, জার্মান ছাড়া উল্লেখযোগ্য পাশ্চাত্য শক্তিগুলি সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে ক্রমশ শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। লন্ডনের সোভিয়েত দূতাবাস আক্রান্ত হয়। ১৯২৭ সালে ইংলন্ডের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তৃতীয়ত, চিয়াং-কাই শেক কমিউনিস্ট বিরোধি হয়ে ওঠেন। স্বাভাবিকাবেই রুশ চীন সম্পর্কের অবনতি হয়। জার্মানির সমর্থন ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে কূটনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ত।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও স্টালিনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৭২ সাল নাগাদ স্টালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান নিয়ন্তা হয়ে ওঠেন। তিনি বুখারিন, কামেনেভ ও জিনোভিভের মতো দক্ষিণপন্থী নেতা এবং ট্রটস্কির মতো বামপন্থী নেতাদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করেন। কামেনেভের নীতি অনুসারে বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। তিনি প্রিওব্রাঝেনস্কির (Preobrazhenskey) বিকল্প নীতি অনুসারে বৈপ্লবিক পথে সোভিয়েত অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করেন। কৃষিক্ষেত্রকে পুরোপুরি সামগ্রিকীকরণ (Collectivization) করা হয় এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারি শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। স্টালিনের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি সামরিক শক্তিরূপে গড়ে তোলা। সামরিক শক্তিতে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে পারলে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের সমর্থন বা অসহযোগিতায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হত না।

পশ্চিমি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও, সোভিয়েত ইউনিয়ন যৌথ নিরাপত্তা, নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯২৭ সালে লিটভিনভ নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। রাশিয়া লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান এবং পরে ফ্রান্স ও পোলান্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯২৮ সালে রাশিয়া অন্যান্য দেশের সঙ্গে কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে—এই চুক্তিতে লক্ষ্যপূরণের উপায়রূপে যুদ্ধকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

**[উৎস : I Deutscher, *Stalin a political Biography Source.*]

সহযোগিতার ফলে জার্মানির এমন কতকগুলি সামাজিক গোষ্ঠীর সমর্থন সোভিয়েত ইউনিয়ন লাভ করেছিল, যারা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় শত্রু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় এবং ভার্সাই চুক্তির কঠোর ধারাগুলি জার্মানিকে পশ্চিমি কূটনৈতিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিচেরিন গোপনে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী র‍্যাথেনাই-এর সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করেন।

ধনতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে সোভিয়েত নৈকট্যের প্রথম পরিচায়ক (১৯২১) ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্যচুক্তি। এর পরেই রুশ-জার্মান বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

রুশ জার্মান মৈত্রীর চূড়ান্ত পর্যায় সূচিত হয় র‍্যাপালো চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে। এই চুক্তি দুই সরকারের মধ্যে পূর্ণকূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। রাপালো চুক্তি লেনিনের তত্ত্বের সাফল্যের পরিচায়ক। দ্বিতীয়ত, দুই দেশ পারস্পরিক বাণিজ্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জার্মানি রাশিয়াকে বাণিজ্য ঋণ দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। তৃতীয়ত, লালফৌজ পাশ্চাত্যের প্রাগ্যসর সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করে। চতুর্থত, একটি গোপন সামরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে জার্মানি ভবিষ্যতে ভার্সাই চুক্তির নিরস্ত্রীকরণ ধারা অস্বীকার করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। ইয়োরোপের দুই অন্তজ রাষ্ট্রের মৈত্রী স্বাভাবিকভাবেই ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে আহত করে। জেনোয়া সম্মেলনে এই চুক্তির সংবাদ যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তা থেকেই এই চুক্তির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অনুভব করা যায়। এর আগে পর্যন্ত মিত্রশক্তিতে পৃথকভাবে রাশিয়া ও জার্মানির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হত। রাপালো-উত্তর পর্বে মিত্রশক্তিকে সম্মিলিত রুশ-জার্মান শক্তির মোকাবিলা করতে হল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ধনতান্ত্রিক বিশ্বে পা রাখার জায়গা পেল। জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসে রাপালো একটি যুগবিভাজিকা সূচিত করে। বিশ্ব রাজনীতিতে ভার্সাই চুক্তি ও লোকার্নো চুক্তি মধ্যবর্তী পর্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল রাপালো চুক্তি।

অর্থাৎ ট্রটস্কির বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্নের অবসান ঘটে। আবার উল্টোদিকে, কমিনটার্ন তখনও পর্যন্ত কমিউনিস্ট বিপ্লবকে উৎসাহিত করছিল। যেমন ১৯২১ এবং ১৯২৩ সালে জার্মানিতে বিপ্লব প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। এমনকি, পাশ্চাত্য পুঁজি কাজে লাগাতে গিয়েও মতাদর্শ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। কামেনেভের ভাষায়, 'মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে রাশিয়ার উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি পুঁজি নিজের নিজের কবর নিজেই খুঁড়বে।' ("While Strengthtenings Soviet Russia, developing her productive forces, foreign capital will fulfil the role Marx predicted for it when he said the capital was digging its own grave."*)।

স্টালিন পর্ব : ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর স্টালিন তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালের আগে কূটনীতির জগতের সঙ্গে স্টালিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। তিনি প্রথম থেকেই সমাজতন্ত্রবাদের আভ্যন্তরীণ দিকটিতেই বেশী আগ্রহী ছিলেন। বিশ্ববিপ্লবের তত্ত্বকে কেন্দ্র করে তাঁর ও ট্রটস্কির বিতর্ক একটি সার্বজনবিদিত ঘটনা। একজন কট্টর মার্কসবাদীরূপে স্টালিন বিশ্বাস করতেন, কমিউনিজমের আন্তর্জাতিক প্রসার ও জয়যাত্রা অবশ্যম্ভাবী। 'একদেশে সমাজতন্ত্র' (Socialising in one country) প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে দুটি উপায়ে : এক, ভারি শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে অস্ত্র উৎপাদনে রাশিয়াকে স্বনির্ভর করে তোলা এবং দুই, রাশিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এড়িয়ে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার পারস্পরিক বিরোধকে কাজে লাগানোর জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। ১৯২৫ সালে স্টালিন পার্টি কমিটিকে বলেন, "যদি যুদ্ধ শুরু হয় ... আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে, কিন্তু আমাদের সব শেষে বেরনো উচিত। এবং দাঁড়িপাল্লার ভর পরিবর্তনে চূড়ান্ত ভূমিকা পালনের

* [উৎস : X. J. Eudin and H. H. Fisher-Soviet Russia and the West-1920-27.]

মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতির স্বাধীনতা দেয়। পূর্ব ও দক্ষিণ ইয়োরোপে এবং আফ্রো-এশীয়া দেশগুলিতে কমিউনিস্টরা চিহ্নিত হলেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতেন।

১৯২০ সাল নাগাদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিশ্ববিপ্লবের সম্ভাবনা নিতান্ত ক্ষীণ, অন্তত বর্তমানে ক্ষীণ। হাঙ্গেরি ও বেসারাবিয়াতে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী এবং গোটা ইয়োরোপ জুড়ে সাম্যবাদী আন্দোলনের গতি স্তব্ধ। বার্লিনে স্পার্টাকিস্ট অভ্যুত্থান জানুয়ারি (১৯১৯) মাসে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে লেনিন স্বীকার করে নিলেন, যে বিশ্ববিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর অনুমান সঠিক নয়।

৪.৩.২. ধনতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে সমঝোতাপর্ব

বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় লেনিন আভ্যন্তরীণ সংহতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষত, গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি প্রমাণ করে দিয়েছিল যথেষ্ট অস্ত্রসম্ভার উৎপাদন করা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা আশু প্রয়োজন। দুটি লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলেই প্রচুর পরিমাণে পাশ্চাত্য পুঁজির প্রয়োজন। ১৯২১ সালে ১৫ মার্চ কামেনেভ বলেছিলেন, "শ্রমিক জনতার বীরত্বব্যঞ্জক প্রয়াসে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে সক্ষম হব। কিন্তু বিদেশি পুঁজির সাহায্য না নিলে, আমরা ততটা দ্রুত বিকাশ লাভ করতে পারব না যাতে ধনতান্ত্রিক দুনিয়া আমাদের ছাড়িয়ে যেতে না পারে।" ("We, of course, restore our economy by the heroic effort of the working masses. But we cannot develop it fast enough to prevent the capitalist countries from overtaking us, unless we call in foreign capital" উৎস : X. J. Eudin & H. Fisher, Soviet Russia and the West—1920-27.) লেনিন নিজেও ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কো পার্টির সদস্যদের সামনে বলেন, 'রাশিয়ার স্বার্থে আমাদের ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার মৌলিক বিরোধকে কাজে লাগাতে হবে।' প্রধানত, তিনটি বিরোধের ক্ষেত্রকে তিনি চিহ্নিত করেন প্রশান্ত সাগর অঞ্চলে জাপ-মার্কিন বিরোধ, ইয়োরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ এবং সর্বোপরি মিত্রশক্তির সঙ্গে পরাজিত জার্মানির বিরোধ।

১৯২১ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন একই সঙ্গে পাশ্চাত্যের আর্থিক সাহায্য লাভ করার এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এই সময় থেকে নাৎসি-জার্মানির উত্থান পর্যন্ত সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি ছিল, ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার স্ববিরোধকে কাজে লাগানো।

রাশিয়া নিম্নলিখিত কারণে জার্মানি ও মিত্রশক্তির বিরোধকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। প্রথমত, লেনিন বলেছেন, "জার্মান বুর্জোয়া সরকার বলশেভিকদের প্রচণ্ড ঘৃণা করে, কিন্তু এই সরকারের আন্তর্জাতিক অবস্থান, জার্মানিকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে বাধ্য করবে"। ("The German bourgeois government madly hates the Bolsheviks, but the interest of its international position impels it towards peace with Soviet Russia against its own will.") এছাড়া, জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কতকগুলি স্বার্থের মিল ছিল। যুদ্ধোত্তর জার্মানির প্রতিটি রাষ্ট্রনীতিবিদই চেষ্টা করেছিলেন, হয় রাশিয়া নয় পশ্চিমি ধনতন্ত্রগুলিকে নিরপেক্ষ রেখে জার্মানির পুনরুত্থান ঘটাতে। বিশেষত, ফ্রান্সের তীব্র শত্রুতা জার্মানিকে ক্রমশ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তৃতীয়ত, দুই দেশের মধ্যস্থলে পুনরুত্থিত পোলাণ্ড পূর্ব ইয়োরোপে ফরাসি মৈত্রী ব্যবস্থার প্রধান ভরসাস্থল রূপে দুটি দেশে নিরাপত্তার পক্ষেই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। সম্ভাব্য ফ্রাঙ্কো-পোল বিপদের সামনে রাশিয়া ক্রমশ জার্মানির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। জার্মানিও, স্বাভাবিকভাবেই ফ্রান্স ও তার পোলমিত্র সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিল। চতুর্থত, দুটি দেশের আর্থিক

বলশেভিক শাসনকে দীর্ঘায়িত করবে। ১৯১৮ সালে লেনিন বলেছিলেন, "এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যদি আমাদের বিপ্লবকে একা হয়ে থাকতে হয়, যদি অন্যান্য দেশে বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আমাদের বিপ্লবের চূড়ান্ত জয়ের সম্ভাবনা আশাহত হয়ে পড়বে। ("There can be no doubt that the prospects for final victory of our Revolution would be hopeless if it were to remain alone and if it were not for the revolutionary movement in other countries. উৎস : G. F. Kennan—Soviet Foreign Policy 1917-41")। অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনে দুটি বিকল্প ছিল, হয় ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লব ঘটানো, অথবা, সম্ভাব্য ধনতান্ত্রিক অভিঘাতের নীরব সাক্ষী হওয়া। ট্রটস্কির ভাষায় 'হয় রুশ বিপ্লব ইয়োরোপে বিপ্লবী আন্দোলন ঘটাবে, নয় ইয়োরোপীয় শক্তিগুলি রুশ বিপ্লবকে ধ্বংস করবে।' ("Either the Russian Revolution will create a revolutionary movement in Europe, or the European powers will destroy the Russian Revolution." উৎস : *A Fortaine : A History of the cold war from the October Revolution to the Korean War 1917-1950.)*

অধ্যাপক কারের মতে, এই বিরোধিতা দূর করে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার স্বীকৃতি অর্জনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি সোভিয়েত নেতৃবন্দ। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসের পর থেকে বলশেভিক শিবিরে বলা বা না-বলা ধারণা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল। রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব, গণতান্ত্রিক শান্তিচুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি এবং ইয়োরোপের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই রাশিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায়। এই পদক্ষেপের ফলে জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের রণনীতি গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লেনিন রুশ জনগণকে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার পারস্পরিক বিরোধে রক্ত ঝরাতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অভিলেখ্যাগার থেকে সমস্ত গোপন চুক্তির নথি প্রকাশ করে দিলেন, এবং কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়া, কোনো ভূখণ্ড দখল না করেই জার্মানির সঙ্গে ব্রেস্ট লিটভস্কের সন্ধি স্বাক্ষর করেছিলেন। লেনিনের মতে, সাময়িক নতিস্বীকারের বিনিময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এমন এক স্বাধীনতা অর্জন করবে, যে, সকল কূটনৈতিক আদান-প্রদান অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।

জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের পৃথক চুক্তি মিত্রপক্ষ ভালো চোখে দেখেনি। তারা ১৯১৮ সালের ২১ মার্চ বলপূর্বক রাশিয়াকে যুদ্ধে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। রাশিয়ার অভ্যন্তরে কলচাকও দেনিকিনের নেতৃত্বে শ্বেতরুশ বাহিনী ঘোষণা করে। চারিদিক থেকে ব্রিটিশ, ফরাসি, জাপানি এবং মার্কিন বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেন। লাল ফৌজ এই ব্যূহ ভেদ করে নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রকে রক্ষা করে, কারণ তাদের হাতেই ছিল রেলপথের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ।

প্রথম কমিশনার ট্রটস্কি ভেবেছিলেন, তাঁর দায়িত্ব কয়েকটি বিপ্লবী ঘোষণা পাঠানো, তারপর দোকানের ঝাঁপ ফেলে দেওয়া। ট্রটস্কির উত্তরাধিকারী চিচেরিনের ভাষায় "১৯১৯ সালে আমাদের সরকার সরকারি স্তরে খুব অল্প নির্দেশই পাঠিয়েছিল, মেহনতি জনতার উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ আবেদন পাঠানো হয়েছিল।" মস্কোতে আহুত (মার্চ ১৯১৯) থার্ড ইন্টারন্যাশান্যাল অথবা কমিনটার্ন এক ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং গ্রেগরী জিনোভিভকে প্রথম সভাপতি নির্বাচিত করে। এই সংগঠনের সভায় ধনতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপের বিস্তারিত পরিকল্পনা রচিত হয় এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক সংগঠনগুলিকে সাহায্য দেবার চেষ্টা করা হয়। আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে উৎসাহিত করার জন্য ছড়িয়ে পড়ে। ধনতান্ত্রিক সরকারগুলি কমিনটার্নের ক্রমবর্ধমান কাজে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। বহু সরকার শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিস্টদের বাক্ স্বাধীনতা,